ভূমিকা

এযুগের সভ্যতা বলতে আমরা য়ুরোপের সভ্যতাই বুঝি। এই সভ্যতা জগতের জ্ঞান ও কৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করেছে সত্য, কিন্তু এর বাইরের আবরণে ঢাকা আছে সব-কিছু গ্রাস করার একটা নিষ্ঠুর আকাঙ্ক্ষা। নীতির দিক থেকে য়ুরোপীয়ানরা খৃশ্চান হলেও কাজের সময় তারা কামান, বোমা ও বিষগ্যাসেরই বেশী পক্ষপাতী, ত্যাগ ও শান্তির কথা তাদের সভ্যতার ডায়েরীতে লেখে না। স্বার্থের জন্য দুর্ব্বলের টুঁটি টিপে ধরতে তাদের বাধে না কোথাও। আবিসিনিয়া যুদ্ধও য়ুরোপীয় সভ্যতার এমনি এক কাহিনী। উনিশ-শো-পয়ত্রিশ সালের ৬ই অক্টোবর ইতালিয়ান্ সৈন্যরা গায়ে পড়ে' হাবসীদের সঙ্গে 'ওয়াল্-ওয়ালে' ঝগড়া বাধিয়ে দিলে। হাবসীরা তৈরি ছিল না, তৈরি হবার মত সময়ও তারা পেল না। মাসের পর মাস ধরে ইতালিয়ানরা অরক্ষিত গ্রাম ও নগরের উপর বিষগ্যাস ও বোমা ফেলতে লাগলো। কত গ্রাম শ্মশান হয়ে গেল, কত নিরীহ ছেলেমেয়ে প্রাণ হারালো। শেষে পরের বছর ৯ই মে সমগ্র আবিসিনিয়া দখল করে তবে ইতালিয়ানরা শান্ত হোল। এই হোল মোটামুটি আবিসিনিয়া যুদ্ধের কথা। এই যুদ্ধে য়ুরোপের সভ্যতা যেভাবে আত্ম-প্রকাশ করেছে তাতে সমগ্র জগৎ আজ ভয় পেয়ে গেছে—এই সভ্যতাই একদিন জগৎকে ধ্বংস করবে হয়তো।

আধুনিক যুদ্ধ-কাহিনী নিয়ে বাংলা সাহিত্যে কিশোরদের জন্য মৌলিক উপন্যাস আজও লেখা হয়নি। এড্‌ভেঞ্চার কোন্‌কিছু লিখতে হলেই আমরা একেবারে আফ্রিকার নর-খাদকদের আজগুবি আড্ডায় গিয়ে উঠি।—এটা একেবারে নেহাৎ একঘেয়ে হয়ে গেছে। সেইজন্য আমি

একটা নতুন দিকে রসসৃষ্টি করার চেষ্টা করলুম। এই বইয়ের মধ্য দিয়ে বাংলার কিশোরেরা বর্ত্তমান জগতের একটী বিশেষ রূপের সঙ্গে পরিচিত হতে [illegible]লেই আমি বিশ্বাস করি। আমার পাঠক পাঠিকারা যদি এই বইখানি পড়ে য়ুরোপের যুদ্ধোৎসাহী সভ্যতার সঙ্গে ভারতের শান্তি ভ্রাতৃত্ব ও অহিংসা নীতির তুলনা করে মাতৃভূমির শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করতে পারে তাহলেই আমার এই বই লেখা সার্থক হবে।

এই বইখানির প্রসঙ্গে কয়েকটী নাম উল্লেখ না করলে অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে। প্রথমেই হচ্ছেন 'মাসপয়লা'র সম্পাদক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, তাঁর কাছ থেকে তাগিদ না এলে এই বই কোনদিনই লেখা হোত না। সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল আবিসিনিয়া সম্বন্ধে আমাকে অনেক তথ্য ও বই সংগ্রহ করে দিয়ে সাহায্য করেছেন। শিল্পীবন্ধু শ্রীঅনন্ত ভট্টাচার্য্য অসুস্থ দেহে অনেক কষ্ট স্বীকার করে বইখানি সুচিত্রিত করে দিয়েছেন। শ্রীসুধীন ভট্টাচার্য্যও কয়েকখানি ছবি এঁকে দিয়েছেন। এঁদের কাউকেই আমি একটা হাল্কা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছোটো করে দিতে পারি না, এঁদের সঙ্গে সে-সম্পর্কও নয়।

বইখানি লেখার কাল ১৩৪৩ ও তার পরের বছর। ইতি—

শারদীয়া ১৩৪৫
কলিকাতা } শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

বিনয় বাবুর কোর্ট মার্শাল

—২২১ পৃষ্ঠা

কাল লড়তে গিয়েছিল, প্রত্যেককে পাঁচ টাকা করে বাবুরা বকশিস দিলেন। সেদিন আমড়া তলায় মধু সর্দ্দারের কি খাতির!

আরেকদিকে তখন বিলের ধারে রাম সর্দ্দারের মৃতদেহের সংকার করে মামুদপুরের হীরু দোলাই প্রতিজ্ঞা করলে—আমার বাবাকে মারার শোধ যদি না তুলতে পারি তো আমি বাপের ব্যাটাই নয়, আমড়াতলার চৌধুরীদের যদি শিক্ষা দিতে না পারি তো নাম বদলে রাখলো।"

তা হীরু দোলাইয়ের রাগ হবারই কথা, বাপ খুন হলে কে কোথায় কবে চুপ করে সয়। তার উপর হীরুর হাতের লাঠি ছিল নারায়ণের সুদর্শনের মতই অজেয়।

দিন কতক পরের কথা।—

ভাদ্রের ভরা নদীর টলটলে জলের বুক চিরে একখানি ছিপ্ ছুটে চলেছে ধারালো বর্শার মত। চারখানি দাঁড় ছিপের দুপাশে জলের বুকে পড়ছে, উঠছে,—ছল্-ছল্ ছলাৎ ছল্! পাঁচটী ছেলে তারই তালে তালে সুর ধরেছে—

অথৈ তল্
নদীর জল্
দাঁড়ে ঘায়ে
এগিয়ে চল্
এগিয়ে চল্—

দাঁড়ের বল্
ছলাৎ ছল্
অথৈ তল
নদীর জল
এগিয়ে চল্
এগিয়ে চল্-

বৈঠায় বসে একজন সুর দিচ্ছে আর চারজন তারই পদ ধরে দাঁড় ফেলছে, তুলছে। ছিপের গতিও যত ক্ষিপ্র হচ্ছে, গানের পদও ততই দ্রুত গীত হচ্ছে। আমড়াতলার পাঁচটা ছেলে আগামী রামহাটির বাইচ্ খেলার জন্য তৈরী হচ্ছে।

কখন আকাশের কোন্ এক কোণে একখানি কালো মেঘ উঠেছিল কেউ আর তা লক্ষ্যই করেনি। একটা দমকা ঝড়ো হাওয়া যখন ধাক্কা দিলে তখন তারা চমকে উঠলো,—মেঘখানি তখন বড় হয়ে খুব বেশী এগিয়ে না এলেও ঝড়ের আভাস দেখা দিয়েছে। এদিকে তারা এসেও পড়েছে অনেক দূর, উজান ঠেলে ফিরতে গেলেও সময় লাগবে। কাজেই ঝড় ওঠার আগে নদীর তটের উপর ছিপখানিকে তুলে নিয়ে তারা অপেক্ষা করতে লাগলো।

দেখতে দেখতে ঝড় উঠলো। দমকা বাতাস শন্শন্ করে ছুটলো এদিকে ওদিকে। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে—

ঝির ঝির ঝির ঝির করে শব্দ উঠলো। গাছ হেলে পড়লো ঝড়ের টানে। নদীর জল ফুলে ফুলে উঠলো, দু'পাশের তটে গিয়ে আঘাত করতে লাগলো—ছলাং ছলাং।

তারপর নাবলো বৃষ্টি ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্। বড় বড় ধারালো এক একটা ফোঁটা গায়ে এসে বিঁধতে লাগলো তীরের মত। অতবড় একটা বটগাছের নীচে দাঁড়িয়ে থেকেও পাঁচটী বন্ধু রেহাই পেল না। ঝড়ে আর জলে দেখতে দেখতে তারা ভিজে-বেড়ালটী হয়ে উঠলো।

ঝড়-জল যখন থামলো তখন সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে উঠেছে।

ছিপখানি জলে ভাসিয়ে সবে মাত্র তারা ক'জন উঠে বসেছে এমন সময় ওদিক থেকে নদীর বাঁক ফিরে একখানি পান্‌সি এসে তাদের সামনে দাঁড়ালো। মাঝি ছৈয়ের উপর থেকে জিজ্ঞেস করলে—কোত্তাবাবুদের কোথায় ঘর গো?

—আমড়াতলা।

—বাইচ্ খেলতে বেরিয়েছিলেন বুঝি?

—হ্যাঁ।

—এবার ফিরেত্ যাচ্ছেন বুঝি?

—হ্যাঁ।

—ভালই হোল, আমরা সঙ্গী পেলাম। তা এখনও তো

বৃষ্টি ধরে এলো বাবু, আপনারা ভিজে যাবেন কেন, আসুন না আমার ছৈয়ের মধ্যে—

—তোমরাও কি আমড়াতলায় যাবে নাকি ?

—না, দাদাবাবু, আমরা মামুদপুর।

মামুদপুর!—আমড়াতলার চৌধুরীদের ছোট ভাই ছিল সেই ছিপে, সঙ্গীদের বললে—না, ওদের সঙ্গে যাব না, ছিপ ঘোরাও—

বিশু হাল বেঁকিয়ে ধরলে, ছিপখানি পানসির গা ঘেঁসে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবে, এমন সময় পানসির মাঝি হেসে বললে—ওঃ, আমড়াতলার ছোটবাবুও আছেন দেখ্‌ছি! তারপরেই জোর গলায় হাঁক দিলে—বলি ওরে মধো, আমড়াতলার ছোটবাবু যায় ওই পাশের ছিপে, দেখতো—

—এই যে দেখি, কেষ্টা আয়—বলে একজন দাঁড়ি দাঁড় ছেড়ে তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে পড়লো ছিপের উপর। ছোট ছিপ, আচম্‌কা একটা মানুষের ভার সইতে পারলে না, উল্‌টে গেল।

কেস্টা এবার পানসি থেকে জলে লাফিয়ে পড়লো। পানসি থেকে জলে দড়ি ফেলা হোল। অমন অন্ধকারেও ছেলে পাঁচটাকে খুঁজে নিতে বেশী দেরী হোল না। হাতে, পায়ে, কোমরে, যেখানে তাদের সুবিধা পাওয়া গেল মধু আর কেষ্টা একটা করে দড়ির ফাঁস বেঁধে দিল। তারপর সেই দড়ি টেনে পাঁচজনকে তারা পানসিতে তুলে নিলে। ওদিকে ছিপখানা জলের টানে

ভেসে যায় দেখে মাঝি হাঁকলে—ওরে ছিপ্‌খানা ছাড়িসনে, ওইটে করে বিলের বাবুদের কাছে মুণ্ডু পাঁচটা উপহার পাঠাবো—

মধো ও কেষ্টা সাঁতরে গিয়ে ছিপখানাকে ধরলে, বেঁধে নিলে পানসির পিছনে।

নিখিলেশরা ভিজে জামা কাপড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দমকা হাওয়ায় কাঁপছে দেখে মাঝি বললে—হীরু দোলাইয়ের নামে দশখানা গাঁয়ের লোক ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকে, আর তোমরা সেদিনকার ছেলে, আমার কথা পায়ে ঠেলে অম্‌নি তরতর করে ছিপ হাঁকিয়ে দেবে ভেবেছ? আরে বাপু আমরা কি এতই সোজা লোক!

বিশু কলকাতার কলেজে পড়ে, বক্‌সিং করে অল্প বয়সেই শরীরটাকে সে বেশ মজবুত করে তুলেছে, সাহস তার একটু বেশী, বললে—আপনি সহজ লোক হন, আর শক্ত লোক হন, তাতে আমাদের কিছুই যায় আসে না, আপনি আমাদের আটকালেন কেন?

—কেন আট্‌কাবো না?—মাঝি গর্জ্জে উঠলো—আমড়াতলার চৌধুরীদের লেঠেলরা আমার বাবাকে মেরে বিলে ভাসিয়ে দিয়েছিল, আর আমি তাদের ছোটভাইকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দেব, শোধ নেব না?

—সেই লেঠেলদের সঙ্গে তখন লড়তে পারেন নি? এখন আমাদের ছেলেমানুষ পেয়ে—

—দেখ ছোকরা, বলে মাঝি এক ধমক দিলে, আমার উপর [illegible]র কথা বোল না, সে-রাতে আমি বাবার পাশে থাকলে আমড়াতলার একটা লেঠেলও মাথা নিয়ে ফির্‌তো না।

—হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি কি রকম বীরপুরুষ তাতো জানতেই পেরেছি, নাহলে আমাদের মত ছেলেদের উপর—

হীরু দোলাই এবার সত্যই রেগে উঠলো, বললে—দেখ ছোকরা, বেশী ফরফর করো না বলছি, বেশী কথা বললে তোমার ওই জিব কেটে কুকুর দিয়ে খাওয়াবো!

—হ্যাঁ হ্যাঁ সব করবেন, মনে রাখবেন এটা ইংরাজ রাজত্ব!

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আমি বেশ ভালই জানি। আমার বাবা যখন খুন হ'ন, তখনও এটা ইংরাজ রাজত্বই ছিল!

—আইন-আদালত করেন নি কেন?

—আমার আইন-আদালত এখন আমি নিজে, পরের কথা পরে, বলে মধোর দিকে ফিরে বললে—মধো, ছোঁড়াগুলোর হাত পা বেঁধে ছইয়ের মধ্যে ফেলে রেখে দে—

শুধু হুকুম করার অপেক্ষা! সর্দ্দারের মুখের কথা কাজে পরিণত হতে দশ মিনিটও লাগলো না। ছইয়ের মধ্যে কাঠের পাটাতনের উপর পাঁচ বন্ধু হাত-পা বাঁধা পড়ে রইল। একদিকে মশার কামড়, আরেকদিকে মনের দুশ্চিন্তা।

কতক্ষণ পরে পানসি তীরে ভিড়লো। এদের পাঁচজনকে

নামিয়ে নেওয়া হোল। সামনেই খানকয়েক গোলপাতার ঘর। ওদিকে এক জায়গায় আগুন জ্বেলে জনকতক লোক তাড়ি খাচ্ছিল, সর্দ্দার পানসি থেকে নামতেই তারা সব ছুটে এল। তাদের মুখের পানে তাকিয়ে সগর্ব্বে সর্দ্দার বললে—এসব কাদের নিয়ে এসেছি, দেখছিস্? আমড়াতলার চৌধুরীদের ছোটবাবু আর তার সাঙ্গপাঙ্গ!

—আমড়াতলার ছোটবাবু! সকলে অবাক।

—হ্যাঁ, আমড়াতলার ছোটবাবু। ওদের লেঠেলরা আমার বাবাকে দেবীচরের বিলে খুন করেছিল, এই নিখিলেশ চৌধুরীকেও আজ আমি ভাসাবো ওই দেবীচরের বিলে। তোরা সব ঠিক হয়ে নে, এখুনি তোদের যেতে হবে দেবীচরে।

দেবীচর নাম-করা যায়গা, সেখানে কত লোকের প্রাণ গেছে। বিলের তীরে বহুদিনের এক দেবী-মন্দির আছে। লোকে বলে ওই মন্দিরের জন্যই বিলের নাম হয়েছিল দেবীচর। সেখানে এক তান্ত্রিক থাকেন বলে শোনা যায়। তার দু-চার ক্রোশের মধ্যে মানুষের বসতি নেই। সেখানে দশটা লোককে খুন করলেও কেউ জানবে না।

বিশু মুখফোড় ছেলে, বললে—আমাদের দেবীচরে নিয়ে যাবে কেন, সর্দ্দার?

—সেখানে গেলেই জানতে পারবে।

—আমাদের অপরাধ?

—ওই নিখিলেশ চৌধুরীকে জিজ্ঞেস্ করো।

—তার মানে? তোমরা মারামারি করে মার খেলে, লড়তে পারলে না, আর ছেলেমানুষ পেয়ে আমাদের উপর বীরত্ব ফলাবে!

হীরু সর্দ্দার এগিয়ে এসে তার গালে ঠাস করে এক চড় মেরে বললে—দেখ ছোকরা, বেশী বকবক কোরো না, তুই চড়ে বদন বিগড়ে দোব। কার সঙ্গে কথা বলছ, জান?

এই সময় একজন লোক তুটী লম্বা বাঁশের লাঠি এনে সর্দ্দারের হাতে দিলে। সে লাঠি জোড়াটা হাতে নিয়ে একবার ভাল করে পরীক্ষা করে সর্দ্দার বললে—দেখ, ওই নিখিলেশ ছোঁড়াটাকে আমিই নিয়ে যাচ্ছি, তোরা বাকী চারটেকে নিয়ে আয়, বলে নিখিলেশকে পিঠে তুলে নিয়ে কোমরের গামছাখানা দিয়ে তাকে পিঠের সঙ্গে বেঁধে ফেললে, তার বাঁধা হাতত্নখানার মধ্যে দিয়ে মাথাটা গলিয়ে নিয়ে হাতের লাঠি তুখানার উপর এক লাফে উঠে দাঁড়ালো তারপরেই ঠক্ঠক ঠক্ঠক্—রণ পা ছুটে চললো মাঠের বুক দিয়ে—

সেখান থেকে দেবীচর হাঁটা-পথে ক্রোশ পাঁচেক হলেও, রণ পায়ে যেতে বেশীক্ষণ লাগলো না। কিন্তু তারই মধ্যে নিখিলেশের তুর্দ্দশার আর সীমা রইল না। রণপায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছোটার তালে তালে হীরু সর্দ্দারের কাঁধে লেগে হাত

দুটি কনুইয়ের কাছ থেকে যেন ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে চায়। বেদনায় নিখিলেশ গোঁয়াতে লাগলো। গোঁয়ানি শুনে হীরু এক ধমক দিলে, বললে—এই ছোঁড়া, কানের কাছে গোঁ গোঁ করিসনে বলছি, তাহলে এই বিলে তোকে জীয়ন্ত পুঁতবো—

নিখিলেশ চুপ করলে। কিন্তু চুপ করে থাকার যো কি! শেষে নিখিলেশ পাগলের মত হয়ে সর্দ্দারের কাঁধে এক কামড় বসিয়ে দিলে।

আর যায় কোথা! রণ পা থেকে নেমে হীরু এমন কয়েকটা চড় বসিয়ে দিলে যে নিখিলেশ তো অজ্ঞান হবার যোগাড়।

তারপর আবার রণপায়ে চড়ে সর্দ্দার এগুলো, বিলের পাশ দিয়ে পায়ে চলা পথ ধরে—দৈত্যের মত উঁচুনীচু গাছগুলোর মাথা ছুঁয়ে।

কতক্ষণ পরে সর্দ্দার এসে পৌঁছল, দেবীচরের মন্দিরে।

মন্দিরের জীর্ণ চাতালে নিখিলেশকে যখন নাবিয়ে দিলে, হাতের ব্যথায়, প্রহারের বেদনায় সে তখন মূর্চ্ছিতের মত। খানিকক্ষণ সে জড়ের মত পড়ে রইল। ইতিমধ্যে অপর চার-জনকে নিয়ে দলের সবাই এসে পড়লো। তাদের ক'জনকে চাতালে ফেলে রেখে, মশাল জ্বেলে সামনের ফাঁকা মাঠে সবাই গিয়ে জড়ো হোল। তারপর সুরু হোল তাড়ি খাওয়া আর হল্লা।

কতক্ষণ পরে হীরু সর্দ্দারের গলা শোনা গেল—কইরে,

এবার ছোঁড়াগুলোর একটা ব্যবস্থা কর আর খানিক পরেই যে সকাল হবে—।

কে একজন জিজ্ঞেস করলে—আগে চান করিয়ে আনতে হবে তো ?

—নিশ্চয়ই !

—আমাদের বলি দেবে নাকি সর্দার ? বিশু চীৎকার করে উঠলো।

—আরে বলি কি রে ? মায়ের চরণে জীবন উৎসর্গ করবি—এ তো বড় ভাগ্যের কথা,—বলে হীরু সর্দার হি হি করে হেসে উঠলো।

—কিন্তু আমরা কি করেছি সর্দার ?

—আমার বাবাকে খুন করেছ, আবার কি করবে ?

—আমরা তোমার বাবাকে খুন করেছি ?

—আরে চল্ চল্, বেশী ফর ফর করিসনে—বলে ক'জন উঠে এসে তাদের টেনে নিয়ে গেল সামনের বিলে।

চারিদিকে বেশ অন্ধকার। বিলের জলে মাঝে মাঝে ছল্ ছল্ করে এক শব্দ শোনা যাচ্ছে। শরবনের পাশ দিয়ে সরসর করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। বড় বড় গাছের মাথাগুলি দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। সর্দারের লোকেরা পাঁচজনের মাথায় জল ঢেলে স্নান করাতে সুরু করে দিলে।

একে সন্ধ্যাবেলা বৃষ্টির জলে ভেজা, তার উপর এই মাঝ

রাতে স্নান। নিখিলেশরা এক একজন যেন, এক একটা ফাঁসীর আসামী, ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে।

এখুনি তাদের মৃত্যু ঘট্‌বে। ওই ভাঙা মন্দিরে ডাকাতে-কালীর সামনে এই দুর্দ্দান্ত লেঠেলগুলি তাদের বলি দেবে। কত ছেলেই তো এখানে বলি হয়েছে শোনা যায়। এমন সুন্দর জগৎ, এতো ফুল, এতো আলো, এতো ভবিষ্যতের আশা, সব মৃত্যুর অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে। মা, বাপ, ভাই, বোন, কিছুই আর থাকবে না। ভাবতে ভাবতে নিখিলেশের মাথা ঘুরে গেল।

গা আর মোছা হোল না। সেই ভাবেই লেঠেলের দল তাদের নিয়ে মন্দিরের চাতালে এসে উঠলো। মন্দিরের ভিতরে তখন একটা পিদীম জ্বলছে। তার মিট্‌মিটে আলোয় দেখা গেল পূজারীর আসনে বসে আছে, কালো চেহারার একটা লোক। তার পিঠের উপর শাদা পৈতা জোড়া আগেই নজরে পড়ে। পূজারীর সামনে ছোট্ট একটা কালী প্রতিমা। অমন অন্ধকারেও তার টক্‌টকে লাল জিব আর হাতের প্রকাণ্ড ঝক্‌মকে খাঁড়াটা নজরে পড়ে। নিখিলেশ খানিকক্ষণ সেই খাঁড়াটার পানে তাকিয়ে রইল। ওই খাঁড়ার আঘাতেই তাদের জীবনান্ত হবে। ভাবতে ভাবতে সহসা সে তারস্বরে পাগলের মত চীৎকার করে উঠলো।

হীরু সর্দ্দার ঠাট্টা করে বললে,—চেঁচা না তোদের যত খুসী, তোদের চিৎকার শুনে এখানে কেউ আস্‌ছে না, ভয় নেই!

সনির মৃত্যুতে সরোজ ডেভিডও বিনয়বাবুর মনের শান্তি চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে গেল। সনিকে তারা দেখতো ছোট ভাইটীর মত। এতো ঘনিষ্ঠতা এমন আত্মীয়তা জমে উঠেছিল যে, সে-যে ইংরাজের ছেলে, সাদা জাতের ঘরে জন্মেছে, তার ব্যবহারে বাইরের কোন লোক সে কথা বিশ্বাস করতেই পারতো না। সেই সনি এমনি সহসা এতো কম বয়সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে, কে জানতো! *

রাতের পর রাত তিনটী বন্ধুর চোখে ঘুম আসে না। বারান্দায় এক একখানি ইজি চেয়ার পেতে চুপ করে বসে থাকে। মনের মধ্যে কোথায় যে কি ঘটে গেছে, ঠিক বোঝা যায় না। শুধু বুকের মধ্যে যখন তখন ব্যথায় টন্‌টন্ করে ওঠে, একটা চাপা কান্না গলার মধ্যে গুমরে ওঠে। শুধু মনে হয় সনি চলে গেছে—চিরদিনের জন্যেই চলে গেছে। তার হাসি-হাসি মুখখানি, ধব ধবে গায়ের রং, লম্বা ছ'ফুট দেহ, চঞ্চল সরল মন অদৃশ্য মরণ ভীরুর মত লুকিয়ে এসে চুরি করে নিয়ে গেছে! মরে সে আজ কোথায় গেছে? আহা, বেচারা একবার ফিরে আসে না! তাহলে আবার ওই টেবিলটায় বসে চারজনে একসঙ্গে গল্প করতে করতে খাবে, ভোরে উঠে একসঙ্গে চারজন

* সনির মৃত্যুকাহিনী সরোজদের পূর্ব্ববর্ত্তী এ্যাড্‌ভেঞ্চার "আঁধার রাতে আর্ত্তনাদ"এর ঘটনা।

আবার আগের মতই ব্যায়াম করবে, একসঙ্গে পাশাপাশি বসে চারজনে বায়োস্কোপ দেখবে, মোটার চড়ে লেকের ধারে ঘুরবে! উদাস দৃষ্টি সামনের দিকে ছেড়ে দিয়ে তিনজনে চুপ করে বসে থাকে। ভাবনার স্রোতে রাত্রি এগিয়ে যায়।—

নীচের রাজপথে সারিসারি দোকানের আলোগুলি নিভে যায়। পথ নির্জ্জন হয়ে আসে। কখন-কখন একত্র কখানি মোটার হুস্‌হুস্‌ করে ছুটে যায়। ঘুমন্ত রাত চারদিকে ঘুমের জাল ছড়িয়ে দিয়েছে, দিনের জীবন্ত সহর রাতের মৌনতায় মরে যায়। ছুনিয়া ঘুমিয়ে পড়ে, শুধু তিনটী লোকের চোখে ঘুম নেই। বারান্দার আলো নিভিয়ে অন্ধকারে উদাস মনে এক একখানি ইজি চেয়ারে বসে থেকে তারা বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে দেয়। আহারে রুচি নেই, মুখে কথা নেই।

মনের যখন এমনি অবস্থা, সহসা একদিন ছুটি পুরাতন বন্ধু এসে উপস্থিত হোলো,—ডাক্তার বিনয় রায় ও শিল্পী রবি দত্ত। তাদের আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে সরোজদের মন একটু যেন হাল্‌কা হয়ে গেল।

ডাক্তার রায় বললে—আপনাদের তিনজনকেই যেতে হবে। আমি পঞ্চাশ বিঘে জমি নিয়ে এক এগ্রিকাল্‌চারাল (কৃষি) কলেজ করবো আমার দেশে, তারই সব দেখা শুনা করতে নৌকা করে কাল বেরুবো বলে ঠিক করেছি। আপনারাও আমার সঙ্গে যাবেন!

সরোজ জিজ্ঞেস করলে—হঠাৎ এগ্রিকালচারাল কলেজ কেন ?

—ভেবে দেখলুম, টাকা যদি খরচ করতেই হয়, এই দিকেই করা উচিৎ। ভারতবর্ষের শতকরা পঁচানব্বই জন নিরক্ষর চাষা গ্রামে বাস করে। বাকী পাঁচজন সহরে থেকে লেখাপড়া শিখে যা-হোক কিছু চাকরী করে, নাহলে একটা দোকান খুলে বসে। এই শিক্ষিত পাঁচজনের অন্ততঃ দুজনকেও যদি দেশে চাষ-আবাদের কাজে লাগানো যায়, তাহলে চাষ-আবাদেরও উন্নতি হবে, গ্রামের অবস্থাও কিছু ভাল হবে। মূর্খ চাষাদেরও কিছু উপকার হবে। সেইজন্যই এই এগ্রিকালচারাল কলেজ খুলছি। গান্ধিজীর মত শুধু "গ্রামে ফিরে যাও" বলে উপদেশ দিলে তো হবে না। এ যুগে উপদেশের চেয়ে অর্থের মূল্য অনেক বেশী। বুঝিয়ে দিতে হবে, ত্রিশ টাকা মাইনের কেরাণী-গিরির চেয়ে, এদেশে চাষ-আবাদে ঢের বেশী উপায় করা যায়। তাহলেই সকলের দৃষ্টি পড়বে এদিকে।

ডেভিড বললে—তা আমরা তো চাষ আবাদের কিছুই বুঝি না, আমরা গিয়ে কি করবো ?

—আমিও আপনাদের চেয়ে বিশেষ কিছু বেশী বুঝি না। নৌকা করে খানিকটা বেড়ানো যাবে, এই আমাদের লাভ।

ডাক্তারের সঙ্গে কথায় পেরে ওঠার যো নেই, শেষ পর্য্যন্ত সরোজদের যাওয়াই ঠিক হোল।

ট্রেনে যারা ঘুরে বেড়ায়, নৌকা চড়ার আনন্দ তারা জানে না। ট্রেনের ঘর্ঘর শব্দ, ঝক্‌ঝক্ ঝাঁকানি দেহকে পরিশ্রান্ত করে। নৌকার মৃদু দোদুল্ দোলা চিত্তকে স্নিগ্ধ করে, তরতর করে নদীর জলস্রোতের উপর দিয়ে নৌকা নেচে চলে। বিরাট নগরীর ইলেক্‌ট্রিকের আলো ছড়ানো পিচ্ ঢালা পথ, উঁচু নীচু বাড়ীর সারি, অবিরাম ব্যস্ত গতিশীল মানুষের জনতা ছাড়িয়ে শ্যামল পল্লীর প্রান্ত ঘেঁষে তরণী চলে। দুপাশের কলের ধোঁয়া ছাড়িয়ে মাটির শ্যামলিমা চোখে ধরা দেয়। সবুজ প্রান্তরের বুকে রক্ষীর মত দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় বট অশথ গাছ। কোথাও বা তাদের পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারে খড় আর গোল পাতায় ছাওয়া ছোট একটী গ্রাম। ছোট ছেলে-মেয়েদের দেখা যায় মাঠে ছুটোছুটি করতে। স্নানের ঘাটে চোখে পড়ে লোকের সমাগম। প্রান্তরের বুকে বিচ্ছিন্ন গরুবাছুরের দল নিশ্চিন্ত মনে বেড়াতে বেড়াতে ঘাস খায়। তীক্ষ্ণ দুপুরের রোদ আকাশের কালো মেঘগুলিকে পাশ কাটিয়ে পৃথিবীর বুকে নেবে আসে। দিগ্বলয়ের সরল সীমা-রেখা গাছপালার আড়ালে আঁকাবাঁকা হয়ে ওঠে। বাতাসে ফুলে-ওঠা পাল নৌকাকে এগিয়ে নিয়ে চলে তরতর করে ঢেউয়ের মাথায় মাথায় নাচাতে নাচাতে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। আকাশে একটী একটী করে তারা

ফুটে ওঠে। সরোজরা নৌকার বাইরে বসে সন্ধ্যার সৌন্দর্য্যটুকু উপভোগ করে। ঝিরঝিরে বাতাস মৃদু স্নেহের স্পর্শ দিয়ে যায়, মাঝে মাঝে তট থেকে দু'একটা মিষ্টি ফুলের গন্ধ ভেসে আসে। সরোজদের মনে হয় আজ যদি তাদের পাশে সনি থাকতো! মৃত্যুর পর সত্যই কি আত্মা বলে কিছু আছে? হিন্দু ঋষিরা সত্যই কি আত্মা বলে কিছু জেনেছিল, কিছু দেখেছিল? ওই যে মিটমিটে তারাটী সুদূর আকাশের গায়ে ঝিক্‌মিক্ করছে ওইটেই কি সনি?—মৃত্যুর পর আকাশের গায়ে তারা হয়ে ফুটে উঠেছে। তাদের ভুলতে পারেনি তাই তাদের পানে এখনও তাকিয়ে আছে মিট মিট করে। দূরে—কতদূরে এই জগতের সীমার বাহিরে বহুদূরে! নেমে আসার উপায় নেই, কাছে আসার শক্তি নেই! আচ্ছা, উল্কাপাত তো হয়, ওই তারাটি একবার উল্কার মত ছুটে তাদের কাছে চলে আসুক না! তাহলে আবার তারা সনিকে ফিরে পায়!

আকাশের তারার পানে চেয়ে তিনজনে চুপ করে বসে থাকে। চারিদিকে অন্ধকার ঘন গভীর হয়ে ওঠে। তটের প্রান্ত থেকে ঝিঁঝিঁ রব ক্ষীণ হয়ে কাণে এসে পৌছায়। মাঝে মাঝে এক একটা পাখীর ধারালো তীক্ষ্ণ স্বর তীব্র হয়ে ওঠে, মাঝির তামাক খাওয়ার গুরুক গুরুক শব্দ ছন্দের মত শোনায়। চারিপাশ প্রশান্ত স্তব্ধ স্নিগ্ধ শান্ত। উপরে রাত্রির নীল আকাশ চাঁদের আলোয় আর তারার ঝিকিমিকিতে অপূর্ব্বরূপে

মহীয়ান হয়ে উঠেছে। নীচে অন্ধকারাচ্ছন্ন বনবীথিকে ঘিরে জোনাকীর পাঁতি, কোথাও বা দূর থেকে ভেসে-আসা লণ্ঠনের মিটমিটে দীপ্তি। কত পিছনে কোথায় পড়ে আছে কলিকাতা নগর, ইলেক্‌ট্রিকের আলো ছড়ানো পিচঢালা পথকে ঘিরে দুদিকে বাড়ীর সারি, অবিরাম অর্থসন্ধানী ব্যস্ত মানুষের জনতা। একদিকে অধৈর্য্য নগর আরেকদিকে পল্লীর শান্তি, ব্যস্ততা নেই, পরস্পরকে ছাড়িয়ে ওঠার দ্বন্দ্ব নেই। সহরের লোকগুলি অতি ব্যস্ত, একটার পর একটা কাজে ছুটোছুটি করছেই। ক'বছর আগে এরা কেউ ছিল না, ক'বছর পরেও এরা কেউ থাকবে না। তথাপি জীবনের এই বিরাট মায়াময় মিথ্যা স্বপ্নটাকে সত্য বলে মনে করে কত আশা ও আনন্দ, আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনা, সুখ ও দুঃখ, হাসি ও কান্না, ঈর্ষা ও দ্বেষ, দ্বন্দ্ব ও বিবাদ মানুষ সৃষ্টি করেছে। এই জীবনকে ঘিরেই নিউ ইয়র্ক, লণ্ডন বার্লিন, মস্কো ও কলিকাতার মত বিশাল রাজধানী সব গড়ে উঠেছে। এই অস্থায়ী দেহটাকে সুখে রাখার জন্য অট্টালিকা উদ্যান, ইলেক্‌ট্রিকের আলো, কৃত্রিম লেক, নাট্যশালা, ছবিঘর, ট্রাম, বাস, মোটার, ট্রেন, জাহাজ, এরোপ্লেন, রেডিও, গ্রামোফোন, টেলিভিসান ও ফ্রিজিডিয়ার প্রভৃতি কত সুবিধা তিলে তিলে ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়েছে। এই দেহটাকে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কত ধর্ম্মের প্রচার। কত বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্যের মাহাত্ম্য, কত ধর্ম্মের বিরোধ। কত মারামারি

কাটাকাটি রক্তপাত। কত আলেকজাণ্ডার, চেঙ্গিজ, তৈমুর ও মামুদ, নেপোলিয়ন, কাইজার, মুসোলিনী ও হিটলারের আবির্ভাব। কত দাবী-দাওয়া, আইন-কানুন, বিচারালয়, জেলখানা এই দেহটাকে সাজাবার জন্য অতল সাগরের কত মুক্তা প্রবাল প্রাণ্‌হারালো, খনির ঘন অন্ধকার থেকে কত রত্ন সূর্য্যের আলোয় এসে ঝল্‌মল্‌ করে উঠলো। আবার এই মানুষকেই জব্দ করার জন্য কত কামান, ডিনামাইট, গ্যাস, বোমা টর্পেডো সাবমেরিন সৃষ্টি হোল। এই সামান্য তুচ্ছ দেহকে ঘিরে এতো অভিযান—সবই একদিন মৃত্যুর কবলে লয় পাবে। এই সুন্দর জগৎ একদিন চোখের সামনে অন্ধকারে হারিয়ে যাবে—তবু মানুষের এই অভিযান থামবে না।

নৌকা এগিয়ে চলে, চিন্তাও অগ্রসর হয়।

ভাবতে ভাবতে বিনয় বাবু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। ঘুমোতে ঘুমোতে সহসা মনে হয় কে যেন ডাকলে—বিনয়দা চলো—

বিনয় বাবু এদিক ওদিকে তাকালেন, চারিপাশের অন্ধকারে প্রথমে কিছু ঠাহর হোল না, তারপরেই চোখে পড়লো সনি তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে! মৃত লোক ফিরে এসেছে—বিনয়বাবু চমকে উঠলেন। সনি হি হি করে হেসে উঠলো, বললে—ভয় পেলে নাকি বিনয়দা!

বিনয় বাবুর তন্দ্রা টুটে গেল। চোখ চেয়ে দেখেন বাইরে

চাঁদের আলো নদীর জলে ঝল্‌মল্‌ করছে, নদীর জল থেকে চোখ ফিরিয়ে তটের পানে তাকালেন—দূরে প্রান্তর আর বড় বড় গাছগুলি অস্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ছে। বিনয় বাবু তাকিয়ে রইলেন।

কতক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন, হঠাৎ চোখে পড়লো প্রকাণ্ড লম্বা লম্বা কয়েকটা লোক দূরে প্রান্তর পার হচ্ছে। বিনয় বাবু তাকিয়ে ঠিক ঠাহর করতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি সরোজের গায়ে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললেন—দেখ, দেখ—

সরোজ ঢুলছিল, সচকিত হয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী?

—ওই দেখ—

বিনয় বাবুর দৃষ্টি অনুসরণ করে সরোজ দেখলে, তারপর হাঁক দিলে—মাঝি! অ মাঝি!

—কি দাদাবাবু?

—মাঠের উপর দিয়ে এত রাতে ওই কারা যায় দেখতো?

মাঝি কতক্ষণ দেখে বললে—ওরা বোধ হয় ডাকাত দাদাবাবু—

—ডাকাত! সবাই একসঙ্গে বলে উঠলো।

তারপর সরোজ বললে—তীরের পাশ দিয়ে ওদের দেখে দেখে চলো,—

—কিন্তু বাবু,—

—কোন ভয় নেই, আমাদের কাছে বন্দুক আছে! বলে

ঠিক সেই মুহূর্তে খুব কাছ থেকেই একটা চিৎকার শোনা গেল। সকলে সচকিত হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি বিলের ধার ধরে সেই দিকে অগ্রসর হোল।

খানিকটা পথ যেতেই গাছের ফাঁক দিয়ে মশালের আলো দেখা গেল, একটী পুরাণো ভাঙা মন্দিরের সামনে জনকতক জোয়ান লোক বসে হল্লা করছে। সরোজরা একটা বড় বট গাছের আড়ালে এসে দাঁড়ালো।

আবার সেই চিৎকার শোনা গেল।

সরোজ বললে—মন্দিরের ভিতর থেকে চিৎকার আসছে বলে মনে হচ্ছে!

ডেভিড বললে—আমারও তাই মনে হয়।

—কিন্তু এই লোকগুলোর সামনে দিয়ে তো আর মন্দিরে যাওয়া যাবে না!

—পিছন দিয়ে যেতে হোলে তো অনেক ঘুরতে হবে, দেরী হবে—ওদিকে মন্দিরের মধ্যে কি হচ্ছে কে জানে!

সরোজ বললে—আর দেরী করে দরকার নেই বন্দুক চালাই, ওরা যদি পালায় ভাল, নইলে লড়তে হবে—

সকলে বললে—সেই ভাল!

—গুড়ুম! গুড়ুম! গুড়ুম!

সরোজ ও ডেভিড চারবার ফাঁকা আওয়াজ করলে।

যারা নির্ব্বিবাদে বসে তাড়ি খাচ্ছিল তাদের মধ্যে সাড়া

পড়ে গেল—পুলিশ! পুলিশ!! তারপর গাছ পাতার আড়ালে কে যে কোনদিকে সরে পড়লো ঠিক বোঝা গেল না! চারিপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে সরোজরা মন্দিরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো।

পুরাণো ভাঙা মন্দির। এক কালী প্রতিমার সামনে একজন তান্ত্রিক বসে পূজা করছে, আর তার সামনে পাঁচটা ছেলে পড়ে আছে, হাত পা বাঁধা। সরোজরা এগিয়ে গিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করলে—তোমাদের এখানে বেঁধে রেখেছে কেন?

পূজারী ফিরে তাকালো, ছেলেদের হ'য়ে বড় গম্ভীর স্বরে উত্তর করলে—মায়ের পূজার তরে—

—নরবলির জন্য?

—হ্যা।

—কে বলি দেয়, তুমি?

—হ্যা।

—মানুষকে খুন করলে ফাঁসী হয়, জান?

-মায়ের পূজায় নরবলি দেওয়া আর খুন কথা নয়।

—আমি তোমায় নরহত্যার অপরাধে গ্রেপ্তার করলুম—বলে বিনয় বাবু তার দিকে অগ্রসর হলেন।

—তিষ্ঠ! বজ্রগম্ভীর স্বরে তান্ত্রিক বললো—আমায় গ্রেপ্তার করার শক্তি তোমাদের কারুর নেই। মায়ের পূজায় তোমরা বিঘ্ন ঘটিয়েছ, এর প্রায়শ্চিত্ত তোমাদের করতে হবে। আজ

থেকে তোমাদের জীবনের প্রতিটী মুহূর্ত্ত অশান্তিময় হয়ে উঠবে —আমি অভিশাপ দিচ্ছি! বলে সন্ন্যাসী দৃপ্তভাবে মন্দির থেকে বেরিয়ে গেল। তাকে ধরার জন্য সরোজদের একটা হাত পর্য্যন্ত উঠলো না। সামান্য "তিষ্ঠ" কথাটী উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কে যেন তাদের অক্ষম করে ফেললো।

কতক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভেঙে সরোজ বলে উঠলো—হিপ্‌নোটিজম্‌!

বিনয়বাবু বললেন—দৈব শক্তি!

ডেভিড বললে—যাই হোক, উপস্থিত প্রমাণ হয়ে গেল, বন্দুকের শক্তি ওই দুটোর চেয়ে অনেক বেশী। এখন বেচারা-দের বাঁধন খুলে দাও, পরে ও কথা নিয়ে তর্ক করার অনেক সময় পাওয়া যাবে—

সরোজ ও বিনয়বাবু লজ্জিত হয়ে পড়লেন। তখুনি সকলে নিখিলেশ ও তাঁর বন্ধুদের বাঁধন খুলে দিলে। তারা সকলে কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো:—আপনারা এলেন বলেই প্রাণে বাঁচলুম, নাহলে এতক্ষণে ওই তান্ত্রিকের খাঁড়ার তলায় জীবন যেতো!

তারপর নিখিলেশের সঙ্গে পরিচয় হোল, বিলের ওপারেই তাদের জমিদারী। বললে—আপনাদের সহজে ছাড়ছি না, আপনারা আমাদের প্রাণদাতা, যেতে হবে আপনাদের আমাদের ওখানে—

বিনয়বাবুদের কোন আপত্তিই টিকলো না। শেষ পর্য্যন্ত নিখিলেশদের পৌঁছে দিয়ে আসতে তাদের বাড়ী যেতে হোল। সেখানকার আদর আপ্যায়নের কথা লিখে গল্পের ভূমিকা দীর্ঘ করতে চাই না। সেখানে বিনয়বাবুদের কদিন থেকে যেতে হোল।

—এই নিখিলেশের বাড়ী থেকেই হোল এই গল্পের সুরু।

সে রাতে বিনয়বাবু ঘুমোচ্ছিলেন, গভীরভাবেই ঘুমোচ্ছিলেন।

সহসা ঘুম ভেঙে গেল, মনে হোল যেন কে তাঁকে এতক্ষণ ডাকছিল। অন্ধকারে চোখ মেলে দিয়ে কে ডাকছে শোনার জন্য তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাকিয়ে থেকে-থেকে মনে হোল ঘরের অন্ধকারটা যেন অত্যন্ত বেশী, এতো ঘন অন্ধকার জীবনে তিনি কোনোদিন দেখেন নাই, কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করলেন। খানিক তাকিয়ে থাকার পর মনে হোল সেই অন্ধকার যেন সহসা চঞ্চল হয়ে উঠলো, অকস্মাৎ যেন সেই অন্ধকারের কালিমা কেটে গিয়ে আলোর ঝরণা বেরিয়ে এল,—শুধু আলোর ফুলকি! তাঁর খাটের চারিপাশ দিয়ে লাল, নীল, হল্‌দে, সবুজ, বেগুনি নানান্ রঙের আলোর ফুলকি বেরুচ্ছে, খেলা করছে—বিদ্যুতের মত।

সেই আলোর ঝলমলানি বিনয়বাবুর দুচোখ যেন ঝল্‌সে দিলে। বিনয়বাবু খানিকক্ষণের জন্যে বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

ঠিক সেই সময় তাঁর কাণের উপর কে যেন একটুকরো বরফ চেপে ধরলে, মাথার ভিতরটা শিরশির করে উঠলো, পিঠের মেরুদণ্ডের দুপাশ দিয়ে, রক্তস্রোতের মধ্যে চিনচিনে শৈত্যের একটা কনকনানি অনুভব করলেন, কাণের কাছে কে যেন বলে উঠলো—বিনয়দা' চলো—!

বিনয়বাবু ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসলেন, সঙ্গে সঙ্গে রঙিন ফুল্‌কিগুলো সব নিভে গেল, ঘরখানা আবার আগের মতই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

কথাটা সনির গলার, সনিকে দেখতে পাবার আশায় বিনয়-বাবু অন্ধকারেই এপাশে-ওপাশে তাকালেন, কিন্তু কিছুই চোখে পড়লো না। এদিকে ততক্ষণে ঘরের সেই ঘন অন্ধকার দেখতে দেখতে ফিকে হয়ে এল। তার মধ্যে থেকে যেন দুটো নিষ্ঠুর চোখ ফুটে উঠলো—তীক্ষ্ণ চোখ, ধারালো দৃষ্টি! কদিন আগে দেখা সেই তান্ত্রিকের দুটো চোখ কে যেন সেই অন্ধকারের বুকে বসিয়ে দিয়ে গেছে। চোখ দুটো তাকে সম্মোহিত করছে যেন!

বিনয়বাবু তাড়াতাড়ি খাট থেকে নাবতে গেলেন, কিন্তু তখনি তাঁর মনে হোল—খাটের চারিপাশ দিয়ে যেন একজন লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে! ক'মিনিট বিনয়বাবু কান পেতে শুনলেন—স্পষ্ট পায়ের শব্দ। একটীর পর একটী পা ফেলে অন্ধকারে কে যেন খাটখানিকে প্রদক্ষিণ করছে, কোন ভুল নাই!

এ তাহলে নিশ্চয়ই কোন চোরের কাজ, তাঁর ঘরে চোর ঢুকেছে !

চোরটাকে ধরার জন্য তাড়াতাড়ি আলোটা জ্বেলে দেখবেন বলে বিনয়বাবু খাট থেকে নাবার উপক্রম করলেন। যেই এক-পা নীচে নাবিয়েছেন, অমনি একটা প্রচণ্ড শব্দ হয়ে পায়ের নীচে মেঝেতে যেন আগুন ধরে গেল,—একটা বোমা ফেটে পড়লো যেন। বিনয়বাবু চম্‌কে উঠলেন। কিন্তু তখনই আবার কি ভেবে তিনি আরেক পা মেঝেতে ফেললেন, এবার এ পা'টা আগুনে পড়লো না, পড়লো যেন বরফের মধ্যে—এক সেকেণ্ডে পাখানা বুঝি জমে গেল ! একপায়ে আগুনের জ্বালা আরেক পায়ে বরফের কনকনানি—দুপায়ের অসহ্য যাতনা বিনয়বাবুকে পাগল ক'রে তুললো। সারা দেহে রক্তচলাচল বুঝি বন্ধ হয়ে গেল। বিনয়বাবু স্বপ্নাবিষ্টের মত বিছানার উপর লুটিয়ে পড়লেন তার জ্ঞান লোপ পেল !

ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া ধীরে ধীরে বিনয়বাবুর জ্ঞানহীন দেহের উপর স্নেহের প্রলেপ বুলিয়ে দিলে। শিশির ধোয়া প্রভাতী বাতাসের শীতলতায় মাথাটা ক্রমে ক্রমে হাল্‌কা হয়ে এল—চেতনা দেখা দিল। বিনয়বাবু চোখ খুললেন। যেন অনেকক্ষণ ঘুমোবার পর ঘুম ভাঙ্‌ল।

চোখ খুলে বিনয়বাবু যা দেখলেন, তাতে তাঁর মাথার মধ্যে যেন ইলেক্‌ট্রিকের শক্‌ লাগলো।—

ঘরের মধ্যে ঊষার আলোর আভাস দেখা দিয়েছে মাত্র, আবছা অন্ধকার তখনও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তার সঙ্গে। সেই অন্ধকারে বিনয়বাবু যেন দেখলেন, চোখের সামনে এক বিরাট লম্বা লোক দাঁড়িয়ে আছে, তার মাথাটা গিয়ে ঠেকেছে ঘরের ছাদের কাছে। প্রথমে যেন একটা ছায়া দেখা গিয়েছিল। ক্রমে ক্রমে মুখখানি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠলো ঃ তীক্ষ্ণ ধারালো একজোড়া চোখ, রুদ্র রক্তিম তার দৃষ্টি। চোখের উপরেই প্রশস্ত কপাল, সেই কপালে রক্ত-চন্দনের তিলকটা ভোরের আলোয় জ্বলজ্বল করছে। চোখের নীচেই ধারালো নাক, তারই দুপাশ দিয়ে শাদা দাড়ির ঢেউ ফুলে ফুলে উঠছে।

এই মুখ বিনয়বাবুর চেনা। এই তান্ত্রিককে তিনি দেখেছেন। এই কয়দিন আগে দেবীচরের বিলে ধরা পড়ার ভয়ে যে পালিয়েছিল আজ সেই লোক তার ঘরের মধ্যে তার চোখের সামনে এসে দাঁড়ালো কি করে?

বিনয়বাবু স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন সেই ভয়াবহ মুখের পানে। সে চোখের পানে চাইতে ইচ্ছা করে না, তা না করলেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার উপায় নেই, এমনি আকর্ষণী শক্তি সেই দু'চোখে। টিকটিক্ করে ঘড়িতে এক একটি সেকেণ্ড কাটতে লাগলো, বিনয়বাবুর মনে হোল ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে সেই স্নেহহীনী চোখ তাঁর চোখের পানে চেয়ে আছে!

সহসা স্তব্ধতা শেষ করে অশরীরী ছায়া কথা বলে উঠলো—আমায় তুই ধরতে গেছিলি, আগে তোরই পালা! আমায় ফাঁকি দিয়ে যাবি কোথায়? সব সময় আমি তোর সঙ্গে সঙ্গে ফিরছি। তোদের জন্যে আমার আজীবনের সাধনা ব্যর্থ হয়েছে, তোদের আমি সহজে ছেড়ে দেব ভেবেছিস্?

কথাগুলি বলেই সেই ছায়ামূর্ত্তি মলিনতর হতে হতে ক্রমে অস্পষ্টতার মধ্যে মিলিয়ে গেল।

বিনয়বাবু এবার চোখদুটি রগড়ে ভাল করে চারিপাশে তাকালেন। যুক্তি ও তর্ক দিয়ে মনে মনে ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে নেবার চেষ্টা করলেন: এ কখনই হতে পারে না। রক্ত-মাংসের দেহে কোন লোক এভাবে বাতাসের সঙ্গে মিশে যেতে পারে না—এ শুধু স্বপ্ন!

বিনয়বাবু এবার বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন।

বাহিরের বারান্দায় বিনয়বাবু খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়ালেন। এই সময় সনিকে নিয়ে তিনি ব্যায়াম করতেন। সে সনি আর নেই। কালের চাকার নীচে পড়ে কোথায় সে হারিয়ে গেছে। তিনিও সেই থেকে ওসব ছেড়ে দিয়েছেন আর ভাল লাগে না।

বারান্দায় মুক্ত হাওয়ায় এদিকে ওদিকে খানিকক্ষণ পায়চারি করতে করতে বিনয়বাবুর কেমন যেন মনে হোল। মনে হোল: তার নিজের পদশব্দ যেন বেশ সশব্দে প্রতিধ্বনি তুলছে

একবার—

দু'বার—

তিনবার—

বারবার বিনয়বাবু ঘোরাফেরা করতে লাগলেন। মনের সন্দেহ দূর করার জন্য তিনি প্রতিটী পদক্ষেপ করতে লাগলেন অত্যন্ত সন্তর্পণে, খুব সাবধানে, অতি ধীরে, একেবারে নিঃশব্দে!

কিন্তু প্রতিধ্বনি এতটুকু কমে নাই, পরিষ্কার সুস্পষ্ট!

এ তা' হলে প্রতিধ্বনি নয়, এ আর কারুর পায়ের শব্দ! কোন অশরীরী প্রেত তারই সঙ্গে পা ফেলে চলেছে, তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে! তবে কি সত্যি সেই তান্ত্রিক সন্ন্যাসীটা অদৃশ্য থেকে তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে? এই খানিক আগে সে যে স্বপ্ন দেখছিল, সেটা তাহলে স্বপ্ন নয়, সত্যি! 'আমি সবসময় তোর সঙ্গে সঙ্গে ফিরছি—' এটা তা হলে স্পষ্ট সত্যি কথা। কিন্তু অমন বিরাট দেহটা নিয়ে সে কি করে অদৃশ্য হয়ে আছে, বিজ্ঞানে তো একথা বিশ্বাস করে না!

—এ তাঁর কি হোল?

বিনয়বাবু কতক্ষণ বারান্দার রেলিং ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর কি-ভেবে বিনয়বাবু নীচে নেবে গেলেন। আর সন্দেহের অবসর নেই—প্রতি

সৈন্যদল মার্চ করে চলে

—১৬৮ পৃষ্ঠা

সিঁড়িতে প্রতিটি পা ফেলার আগে অদৃশ্য মানুষের স্পষ্ট পদক্ষেপ শোনা যাচ্ছে।

নীচে বৈঠকখানাঘরে ঢুকে, খবরের কাগজখানি যেই তুলে নিয়েছেন, অম্‌নি কানের পাশে কে চিৎকার করে উঠলো— খবরের কাগজ পড়ে আর কি হবে? মৃত্যু! মৃত্যু!! মরার জন্য তৈরী হ' !!!

বিনয়বাবু চম্‌কে উঠলেন, কে যেন তাঁকে বিদ্যুতের শক্ মারলে। কিন্তু মানুষ তো কেউ নেই, বক্তাকে দেখারও তো উপায় নেই। চোখ ব্যর্থ হয়েছে, কাণ কিন্তু প্রতিটী শব্দ, প্রতিটী কথা মনের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে! এই অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে মন বোধ হয় আর ধীর ভাবে লড়তে পারবে না, মস্তিষ্ক এবার বোধ হয় দুশ্চিন্তায় বিদ্রোহ করবে। অদৃশ্য শত্রুর কৃপায় চিত্তের চাঞ্চল্য আর মস্তিষ্কের বিকারে সে পাগল হয়ে যাবে, জগৎটাকে জানার ও বোঝার বুদ্ধি উন্মত্ততার কালো পর্দ্দার আড়ালে ঢাকা পড়ে যাবে! এ তার হোল কী?

বিনয়বাবু একখানি সোফায় বসে পড়লেন।

ডেভিড ইংরাজের ছেলে, বিলিতি আব্‌হাওয়ার মধ্যে মানুষ, বিনয়বাবুর কাহিনীকে সত্যঘটনা বলে সে বিশ্বাসই করতে চায় না, বলে—ওসব মনের দুর্ব্বলতা, সনিকে আপনি অত্যন্ত ভালবাসতেন, তার এই অপঘাত মৃত্যু আপনার মনকে বিশেষভাবে

আঘাত করেছে, সেই আঘাতে মনের অনুভূতিগুলো চঞ্চল হয়ে উঠেছে, এই ঘটনাগুলি তারই বাইরের প্রকাশ মাত্র। আস্তে আস্তে শোক কমে গেলে, ওসব অস্বাভাবিক ব্যাপারও মন থেকে মুছে যাবে।

—এ তুমি মনের বিকার বলছ ডেভিড্, কিন্তু সত্যি তা নয়, বিনয়বাবু বললেন, আমি স্পষ্ট শুনেছি, পরিষ্কার সব দেখেছি—এসব একেবারে এই সূর্য্যের আলোর মত সত্যি !

—বেশ তাই যদি হয়, সরোজ বললে, আপনি এখুনি আমাদের সামনে দু'পা হাঁটলেই তো আমরা জানতে পারবো, আপনার আগে আগে সত্যি কেউ হাঁটছে কি না।

—ঠিক কথা, বলে বিনয়বাবু সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর ঘরের এদিক থেকে ওদিক পর্য্যন্ত, একটীর পর একটি পা ফেলে চলে গেলেন।

সরোজ ও ডেভিড স্পষ্ট শুনতে গেল—দুটী লোক ঘরের মধ্যে হাঁটছে !

প্রথমে তারা বিশ্বাসই করতে পারলে না, দুজনেই উঠে এল বিনয়বাবুর পাশে, বললে—আপনি খানিকক্ষণ চলাফেরা করুন তো, শুনি—

বিনয়বাবুর মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল, তিনি আরো ক'বার ঘরের এদিকের দেয়াল থেকে ওদিকের দেয়াল পর্য্যন্ত ঘুরে বেড়ালেন। দুপাশে সরোজ ও ডেভিডও রইল। কিন্তু এবার

আর কোন ভুল নেই, কাণ মিথ্যা কিছুই শোনে নাই—অদৃশ্য লোকটীর পায়ের শব্দ স্পষ্ট ও সত্য! বিনয়বাবুর আগে আগে একটা লোক চলে যাচ্ছে, শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, বুঝতে পারা যাচ্ছে, কিন্তু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

বিনয়বাবু ম্লান হাসি হেসে বললেন—কি, এবার বিশ্বাস হোল তো?

—এমন চাক্ষুষ প্রমাণ অবিশ্বাস করি কেমন করে?

—শুধু কি এই?—কানের কাছে এসে কথাও বলেছে।

—এই পায়ের শব্দের মত সে কথাও কি শোনা যাবে?—আমরা শুনতে পাব?

—সে কথা এখন ঠিক বলতে পারছিনে, বিনয়বাবু বললেন, তবে তোমরা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক সারাদিন। আমি যখন আবার তার কথা শুনতে পাব, তখন তোমরা কাছে থাকলে শুনতে পাও কিনা জানা যাবে।

—বেশ!

সরোজ ও ডেভিড সারাদিন বিনয়বাবুর কাছে কাছে রইল। কিন্তু সারাদিন উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটলো না।

ঘটনা ঘটলো রাত্রে।—

সরোজ ও ডেভিড বিনয়বাবুর ঘরেই ঘুমোচ্ছিল, সহসা ঘুম ভেঙ্গে গেল, মনে হোল খাটের চারিপাশে কে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বেড্‌সুইচ্‌ হাতের কাছেই ছিল, সরোজ তাড়াতাড়ি সুইচটা টিপে ধরলো, আলো কিন্তু জ্বললো না!

বিনয়বাবুর একখানি হাত এসে পড়লো সরোজের গায়ে, বললেন—শুন্‌ছ ?

সরোজ জবাব দিলে—হ্যাঁ।

ডেভিড বললে—আলোটা জ্বাল তো দেখি—

—জ্বল্‌ছে না।

—জ্বল্‌ছে না ?—ডেভিড অবাক্ হয়ে গেল।

—না, ও আলো এখন জ্বলবে না,—সেই ঘরের মধ্যে গম্ভীর স্বরে সহসা কে বলে উঠ্‌লো, আমি ওকে নিভিয়ে রেখেছি। আমার যোগবলের কাছে কি তোমাদের বিজ্ঞানের বল বড় হবে ?

সরোজ জিজ্ঞেস করলে—তুমি কে ?

—আমি ?—আমি এ-যুগের অশ্বথামা। ক'দিন আগে তোমরা আমার তান্ত্রিক সাধনার বিশেষ ক্ষতি করেছ, তার প্রায়শ্চিত্ত তোমাদের করতেই হবে, তোমরা মৃত্যুর জন্য তৈরী হও!

সরোজ ও ডেভিডের মনে হোল তাদের সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কে যেন কথা বলছে, অথচ অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কয়েক লহমা সেদিকে চেয়ে থাকার পর মনে হোল অন্ধকারে নীল দেয়ালটার গায়ে কালো কালো অসংখ্য ছায়া

যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে,—চোখে ধাঁধা লাগে। দেখতে দেখতে সেই কালো কালো ছায়াগুলো ছুটোছুটি করতে করতে সব যেন এক জায়গায় এসে জড়ো হয়ে গেল। আর সেই কালোর

মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে ফুটে উঠলো প্রকাণ্ড দীর্ঘদেহী এক সন্ন্যাসীর মুখ। সেই মুখের কাঁচা-পাকা দাড়ি, কপালে লেপা

রক্তচন্দনের তিলক, রুক্ষ জল্‌জ্বলে দুই চোখের পানে চাইলেই হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি জাগে, মজ্জায় মজ্জায় শৈত্য বোধ হয়।

বালিশের নীচে ছিল ডেভিডের পিস্তল, বাহির করে সাম্‌নের অশ্বত্থামার ছায়াকে সে গুলি করলে।

পিস্তলের শব্দের প্রতিধ্বনি জাগ্‌লো। জানালার কাচের শার্শিগুলো ঝন্‌ ঝন্‌ করে উঠ্‌লো। সামনের থেকে অশ্বত্থামার ছায়া মিলিয়ে গেল। বেড সুইচ্‌ টেপাই ছিল, এবার আলো জ্বলে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের সব কিছু বিভীষিকা ফুরিয়ে গেল।

ডেভিড তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেবে পড়লো। খাটের নীচে, আলমারীর পিছনে, একবার ভাল করে দেখলে, কিন্তু কই কেউ তো লুকিয়ে নেই। দেয়ালটা ফাঁপা কি না, তাও দেখলে. ...তবে ?

ঢং ঢং ঢং করে ঘড়িতে তিনটে বাজলো।

বাকী রাতটুকু তিনজনের চোখে আর ঘুম এল না।

সকাল বেলা কথা হচ্ছিল।

সরোজ বললে—দুষ্ট লোক হয় তো তাকে শায়েস্তা করা যায়, কিন্তু এ-যে শুধু ছায়া, ধরতে-ছুঁতে পারবো না, বন্দুকের গুলি বিঁধবে না—এ এক নতুন রকমের সমস্যা দেখি !

ডেভিড বললে—তাকে আমরা ধরতে পারবো না, অথচ সে

আমাদের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে ভয় দেখাচ্ছে, আমাদের কাণের কাছে এসে কথা বলবে—এ ভারি মজার ব্যাপার কিন্তু!

—আপনারা তো মজার ব্যাপার নিয়ে বেশ আনন্দ করছেন, এদিকে আমার যে প্রাণ নিয়ে টানাটানি।—বলে ডাক্তার বিনয় রায় এসে ঘরে ঢুকলো।

ডাক্তার রায়ের সঙ্গে ছিল আর্টিষ্ট রবি দত্ত। হীরু দোলায়ের দলকে ধরিয়ে দেবার জন্য তারা 'সদরে' গেছিল দিন দুয়েকের জন্য।

—এই যে আসুন, আসুন—বলে বিনয়বাবু তাদের দিকে দুখানা সোফা এগিয়ে দিলেন।

দুজনে বসলো।

ডেভিড জিজ্ঞেস করলে—তারপর, ওখানকার সব ব্যবস্থা শেষ করে এলেন তো?

—কিচ্ছু না। নিখিলেশদের রেখে আমরা চলে এলাম।

—কেন? কি হোল?

—সে অনেক কথা,···বলে ডাক্তার রায় বলতে সুরু করলো, পরশু রাত্তিরে যখন ঘুমোবার যোগাড় করছি···ইত্যাদি।

ডাক্তার রায় যা বললে, তা বিনয়বাবুর ঘটনাই যেন হুবহু নিজের নামে বলে যাচ্ছেন, বলে মনে হোল।

কাহিনী শেষ করে ডাক্তার রায় উঠে দাঁড়ালো, ঘরের এদিক থেকে ওদিক পর্য্যন্ত চলে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—আপনি কিছু

শুনতে পেলেন ? আপনাদের কি মনে হোল আমার আগে আগে কোন অদৃশ্য লোক আমার সঙ্গে চলছে।

ঘরের সকলেই মাথা নাড়লো, বললে—শুনেছি !

ডাক্তার রায় ঝুপ করে সোফায় বসে পড়লো। বললে—এখন এর একটা প্রতিকার আপনাদের করতে হবে, সেই জন্যই এখানে এলাম, নইলে ওই ভূতের হাতেই আমায় মরতে হবে !

সরোজ ব্যাপারটাকে হাল্কা করে দেবার জন্য হেসে বললে,—ভূতের পায়ের শব্দ শুনেই মরার জন্য এতো ব্যাকুল হলে চলবে কেন, আমরা তো এদিকে ভূতের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে বাস করছি ! কই বিনয়দা, দুপাক ঘুরে ডক্টর রায়কে একবার দেখিয়ে দিনতো আপনার সঙ্গে কতগুলো ভূত চলাফেরা করে—

—তার মানে, আপনাদেরও এই ব্যাপার নাকি ? ডাক্তার রায় জিজ্ঞেস করলো।

—তবে কি শুধু আপনার একারই নাকি !

ডাক্তার রায় ও আর্টিষ্ট দত্ত বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল।

সেই দিনই তারা কলকাতায় ফিরলো।

•

সন্ধ্যার দিকে সরোজ সকলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো, বললে চলুন বায়োস্কোপে যাওয়া যাক, এই সব দুশ্চিন্তার হাত থেকে তবু খানিকক্ষণের জন্য ছুটি পাওয়া যাবে—

শ্যামবাজারের দিকে একটা 'হাউসে' তখন একখানি নতুন আমেরিকান ছবি দেখানো হচ্ছিল। গল্পটা যিশুর জীবনী নিয়ে
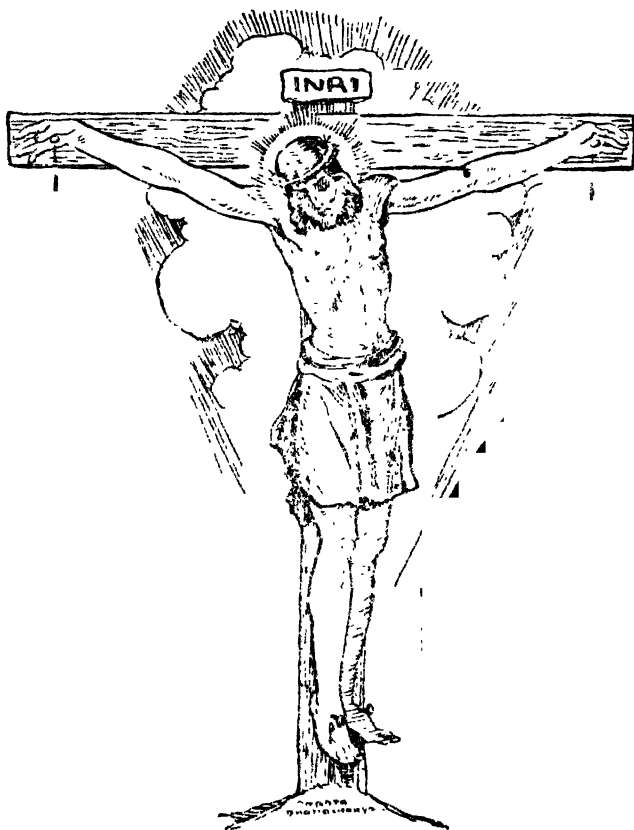
লেখা। মহামানব মানুষের মনকে সুন্দর করে তোলার জন্য চরিত্রকে মহিমান্বিত করে তোলার জন্য ত্যাগের ও সহিষ্ণুতার

বাণী দিকে দিকে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন—সবাই মানুষ, সবাই বন্ধু, সবাই ভাই ; জাতির বিচারে, রূপের তারতম্যে মনুষ্যত্ব কমবেশী পাওয়া যায় না ; নীচ কি ছোট কেউ নেই—ভগবান সকলের, সবাই মানুষ—সবাকার সমান অধিকার ! সবাই শুনলো, বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল সেই মহাপুরুষের মুখের পানে, কেউ তাঁর বাণীকে অন্তরে গ্রহণ করতে পারলো, কেউ পারলো না। যারা সে সত্যকে বুঝলো তারা হোল বন্ধু, যারা তা পারলো না তারা হোল শত্রু। স্বার্থপর শত্রুর দল করলো ষড়যন্ত্র, যিশুর বারোজন প্রিয় শিষ্যের মধ্যে একজনকে টাকার লোভ দেখিয়ে বশ করলে, সে যিশুকে ধরিয়ে দিলে। অনন্য-সাধারণ মহাপুরুষ, বিশ্বাসঘাতককে চিনলেন জানলেন, কিন্তু কিছুই বললেন না। প্রচলিত ধর্ম্ম ও নীতির বিরোধী, সমাজ বিপ্লবী বলে তাঁর বিচার হলো। অপরাধী যিশুকে প্রকাণ্ড কাঠের ক্রুশ ঘাড়ে করে পাহাড়ের মাথায় গিয়ে উঠতে হোল। সেই পাহাড়ের মাথায় কাঁটার মুকুট মাথায় পরিয়ে একটার পর একটা পেরেক বিঁধে জগতের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষকে ক্রুশবিদ্ধ করা হোল। অসহ্য যাতনায়ও যিশুর মুখের ভাব এতটুকু বিকৃত হোল না। যে সব হিংসাপরায়ণ স্বার্থপর মানুষের দল তীক্ষ্ণ উপহাসে ও অসহনীয় নিষ্ঠুরতায় তিলে তিলে তাকে হত্যা করলো, অহিংসার পূজারী শান্ত সৌম্য মহান্ পুরুষ শেষ মুহূর্ত্তে রক্তাক্ত দেহেও তাদের আশীর্ব্বাদ করে গেলেন। কে তখন ভেবেছিল এই লোকটা

আজ যে অমরবাণী প্রচার করে যাচ্ছে,'দুহাজার বছর পরেও জগতের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্য্যন্ত শিক্ষিত জনগণ তা শ্রদ্ধায় স্মরণ করবে।

ছবিখানি চমৎকার, সহজে মন থেকে মোছবার নয়।

ছবি-ঘর থেকে বেরিয়ে সরোজ ঘড়ি দেখলে রাত সাড়ে আটটা। বললে—এর মধ্যে বাড়ী ফিরে কি হবে, চলুন ময়দানে গিয়ে খানিক হাওয়া খাওয়া যাক—

ডেভিড বললে—বড় ক্ষিদে পেয়েছে যে!

—কলকাতার সহরে পকেটে পয়সা থাকলে আবার খাবার ভাবনা! চলো, পথে একটা হোটেলে বসে কিছু খেলেই হবে—

ক'জনে মোটরে উঠে বসবে এমন সময় পাশ থেকে একটা লোক বললে—আপনারা ময়দানে হাওয়া খেতে যাচ্ছেন, যান, কিন্তু মনে শান্তি পাবেন না!

সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা লোকটার মুখের উপর। বয়স পঞ্চাশের কোঠায় এসে পৌঁছেচে, কাঁচা পাকা দাড়িগোঁপে মুখখানি বিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। বিশেষ অসাধারণ কিছু সে মুখে নেই। বিনয়বাবু বললেন—আপনি আমাদের কিছু বলছেন?

লোকটী হাসলে, বললে—হ্যাঁ। বলছি, আপনাদের মনের অশান্তি আপনাদের চোখেমুখে ফুটে উঠেছে, আপনারা এক মারাত্মক সন্ন্যাসীর হাতে পড়েছেন, যত সহজে তার কবল থেকে

আপনারা উদ্ধার পাবেন বলে ভেবেছেন, সে লোকটী তত সহজ নয়। আমি আপনাদের একটা কথা বলতে চাই, তাতে আপনাদের উপকার হবে, কিন্তু এই পথে দাঁড়িয়ে···

অচেনা কোন লোক যদি সহসা মনের কথাটী বলে দেয়, তার সম্বন্ধে বিস্ময় মেশানো শ্রদ্ধা জাগাই স্বাভাবিক, বিনয়বাবু তাড়াতাড়ি বললেন—তার জন্য কি, যদি আপনার কোন অসুবিধা না হয় তো মোটারে আসতে পারেন—

ভদ্রলোক যেন এই কথাটারই অপেক্ষা করছিল, এবার মোটারের মধ্যে উঠে বসলো।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর ভদ্রলোক বলতে সুরু করলেন—দেখুন, দু'পাঁচজন লোক আছে যারা নিয়মিতভাবে অভ্যাস করে অসম্ভব রকম মনের জোর আয়ত্ত করতে পারে। পড়তে পড়তে যেমন ছাত্রদের মেধা ও জ্ঞান বাড়ে, তেমনি যোগের কতকগুলি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে পারলে অসাধ্য সাধন করার মত মনঃশক্তি মানুষ লাভ করতে পারে। ভাল বৈজ্ঞানিকেরা বহুদিন ধরে মাথা ঘামিয়ে যেমন রেডিও, টেলিভিসান, টেলিপ্রিণ্টার, টকি-ফিল্ম প্রভৃতি যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন, তেমনি সত্যিকারের উইল্‌ফোর্স (will-force) যার আছে সে এসব যন্ত্র ব্যতিরেকেই অনেক কিছু জানতে, বুঝতে ও করতে পারে। বিলাতে একটা লোক এখন কি করছে দেখতে

হলে আমাদের টেলিভিসানের সাহায্য নিতে হবে, কিন্তু মনঃশক্তিসম্পন্ন লোক মনের দর্পণে তা এখনি দেখে নিতে পারে, কোন লোককে এতটুকু আঘাত না করে তাদের মনকে আকর্ষণ করে মরণাপন্ন করে তুলতে পারে, মুখের পানে তাকিয়ে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ স্বচ্ছন্দে বলে দিতে পারে। এরা এক একজন অসামান্য পুরুষ, প্রকৃতিকে জয় করে বহুদিন পর্য্যন্ত এরা বেঁচে থাকে! এদের মধ্যে দুটী দল আছে, একদল জগতের উপকারের জন্য জীবন পণ করে, আরেকদল নিজের স্বার্থের জন্য জগতের কোন অপকার করতেই পিছু হটে না। এই শেষের দলটার সংস্পর্শে না আসাই ভাল, কিন্তু আপনারা অজ্ঞাতসারে এমনি এক তান্ত্রিকের কবলে এসে পড়েছেন, তিনি আপনাদের সহজে ছাড়বেন না, তবে আপনাদের মনের জোর আছে বলেই সহজে কিছু করতে পারছে না!

বিনয়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা আপনি আমাদের কথা কি করে জানলেন?

—আপনাদের মুখের পানে তাকিয়ে এই কথাগুলি আমার মনে জাগলো তাই বললাম। আপনাদের বিপদ আসন্ন, তবে কি রকম বিপদে আপনারা পড়বেন তা আমি জানিনা। তবে বিপদ যে রকমই হোক না কেন তার আগেই আপনারা জায়গা বদলে ফেলুন। দুশো পাঁচশো মাইল দূরে চলে গেলে উপস্থিতের জন্য আপনারা তান্ত্রিকের ইচ্ছাশক্তির প্রভাব থেকে হয়তো মুক্ত

হতে পারবেন, তারপর সেখানে যদি তেমন উৎপাত সুরু হয়, তখন সে স্থানও সহসা ছেড়ে চলে' যাবেন—

ডেভিড বললে—তার মানে সারাজীবন শুধু পালিয়ে বেড়াতে হবে ?

—কিন্তু এছাড়া আমি আর তো কোন উপায় দেখি না, তবে যদি কোনদিন কোন সত্যিকারের সাধু সন্ন্যাসীর দেখা পান, তবে সে আপনাদের আত্মরক্ষার কোন রকম ব্যবস্থা করে দিতে পারে···যাক্ আমায় এখানেই নাবিয়ে দিন আমি বালিগঞ্জে যাব—

বেশ চলুন, আমরা না হয় আপনাকে আপনার বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি—বলে সরোজ মোটারের মুখ ফেরাতে যাচ্ছিল, এমন সময় ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললে—না, আমি তা পছন্দ করিনে, আপনাদের দেখে আমার যা মনে হলো, বললুম। আপনারা আমার কথামত সাবধান হতে চান, হবেন, সেজন্য আমায় কৃতজ্ঞতা জানাতে কি আমার সঙ্গে চিরস্থায়ী পরিচয় রাখতে হবে, তার কোন মানে নেই, তা আমি চাইও না। আমি চাই আপনাদের দশ মিনিটের আলাপ দশ মিনিটেই ফুরিয়ে যাক, তা' দিনের পর দিন ধরে টেনে নিয়ে যাবার কোন দরকারই নেই।

—অবশ্য আপনি যদি আলাপ রাখতে না চান······

—দেখুন, বাধা দিয়ে ভদ্রলোক বললে—আপনাদের সঙ্গে

আলাপ রাখা অসম্ভব। অনেক লোককে আমি পথেঘাটে অনেক কথা বলি, তারা সকলে যদি আলাপ জমিয়ে আমার বাড়ী আসতে সুরু করে' তাহলে আমার নিজের কাজকর্ম্ম কিছুই হবে না।

—আপনি কি করেন ?

—চাকরী।

—কেন, আপনি এই বিদ্যের জোরে তো অনেক পয়সা কামাতে পারেন ?

—সে উপায় নেই। যে সাধু এই বিদ্যা আমায় শিখিয়েছিলেন তিনি বলে দিয়েছেন যে কারুর কাছ থেকে টাকা পয়সা কিছু নিলেই বিদ্যা নষ্ট হবে। তাছাড়া সকলের উপকারের জন্য এ বিদ্যা শিখেছি, লোকের বিপদ আসছে জেনেও যদি টাকার জন্য তাকে না সাবধান করি, তাহলে টাকাটাই তো বড় হোল, বিদ্যার দাম তো কিছু রইল না!—টাকা দিয়েই কি দুনিয়ার সব জিনিষ কেনা বেচা হবে! যাক্ সে কথা, মোটার থামান, আমি নাবি—

সরোজি ব্রেক কব্‌লো, ভদ্রলোক নেবে গেল।

লোকটী চলে গেল বটে কিন্তু এই অল্পক্ষণের সামান্য আলাপ, আর তারই মধ্যে কয়েকটী কথা সকলের মনে এমনভাবে রেখা-পাত করে গেল যে, সে রাত্রে আবার আগের মত দুঃস্বপ্ন দেখবার পর বিনয়বাবু স্থির করে ফেললেন, আর কলকাতায়

থাকবেন না। বললেন—আমি আজই এখান থেকে চললুম।—

—ওই অচেনা ভদ্রলোকের কথা শুনেই কাজ করবেন?

দূর থেকে পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির

বাইরে গিয়ে যদি আবার নতুন কোন বিপদের সৃষ্টি হয়

ডেভিড্ বললে।

—তা হোক, কিন্তু এখানে আমি আর থাকতে পারছিনে !

—কোথায় যাবেন ?

—দিনকতক পুরীতে সমুদ্রের ধারে গিয়ে বাস করবো মনে করেছি।

—বেশ, চলুন, আমরা তাহলে সকলেই যাই।

সেইদিন সন্ধ্যায় বিনয়বাবুর বাড়ীতে তালা পড়লো।

পুরীর সমুদ্রতট। আধখানা চাঁদের মত তটরেখা ঘিরে সমুদ্র আপনাকে ছড়িয়ে দিয়েছে। একদিকে ধরণীর ধূসর বালুচর আরেকদিকে নীল চঞ্চল জলরাশি দূরে—বহুদূরে দিগ্বলয়ের ক্ষীণ রেখায় নীল আকাশের গায়ে গিয়ে পৌঁছেচে। বঙ্গোপসাগরের চঞ্চল ঢেউ কলরব করে নেচে নেচে ছুটে এসে লুটিয়ে পড়ছে, তটরেখার বুকে শাদা ফেনার রাশি ছড়িয়ে পড়ছে, জগন্নাথের চরণতলে সাগর-কন্যারা তাদের পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করছে যেন। নীলাম্বুরাশির অসীমতা, তরঙ্গের কলরব, ঊর্ম্মির খেলা, চিক্‌মিকে চাঁদের আলো, বিবর্ণ মেঘের মায়া, ঝিরঝিরে দক্ষিণা বাতাসের খেলা, মানুষকে মুগ্ধ করে, মনকে টেনে নিয়ে যায় রূপকথার কোণ রূপনগরের বুকে। কর্ম্মব্যস্ত নগরের অর্থের কোলাহল মনের কোণ থেকে মুছে যায়, মানুষ ভুলে যায় পিছনে কি ফেলে এসেছে। মন ডুবে যেতে চায় প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের বুকে, বাঁশীর সুরের মত নিজেকে হারিয়ে

ফেলতে চায় নীলাম্বুর মৃদু কলরবের মাঝে। বুকে জাগে অদম্য আকাঙ্ক্ষা—যিনি জগতের এই অনন্ত সৌন্দর্য্যকে এমনভাবে রূপে রূপে সুষমা মণ্ডিত করে চলেছেন, তিনি কোথায় লুকিয়ে আছেন একবার দেখার জন্য!

সরোজ, ডেভিড, বিনয়বাবু, রবিদত্ত ও ডাক্তার রায় কারুর কাছেই সমুদ্র নতুন নয়। কিন্তু তাই বলে সমুদ্র তো পুরানো হবারও নয়, যতই দেখা যায় ততই বিস্ময়, ততই আগ্রহ, ততই রহস্য মনকে মুগ্ধ করে,—মায়াময় সমুদ্র চির নতুন!

সারা দিনরাত সাগর তটে বসে থাকলেও তৃপ্তি নাই।

সকলে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সহসা রাতদুপুরে একটা তীক্ষ্ণ ধারালো চীৎকার সকলের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে।

অদ্ভুত বিকট চীৎকার!—উঠ্‌ছে, পড়ছে আবার তীব্রতম হয়ে কানে এসে বিঁধছে।

সকলের আগে বিনয়বাবু ও ডাক্তার রায় থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বিছানার উপর উঠে বসলো, তারপর বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, তারপর ঘরের দরজা খুলে সামনের সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নীচে নেমে গেল।

ডেভিড চীৎকার করে উঠলো—বিনয়দা! বিনয়দা!!

সরোজ এতক্ষণ থ' হয়ে বসেছিল, সহসা সে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি ব্রাউনিং পিস্তলটা বালিসের নীচে থেকে টেনে নিয়ে সে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। সামনে

অসীম নীল জলরাশি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে, অবিরাম গর্জ্জায়মান জলরাশি বালুতটে এসে আঘাত করছে। সেই তটভূমির সীমা

রেখায় যেখানে ফেনার পর ফেনার রাশ চাঁদের আলোয় ঝলমল করে উঠছে তারই পাশ দিয়ে এক দীর্ঘ দেহী জটাজুটধারী পুরুষ তাদের হোটেলের পানে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

ভাল করে লোকটীর পানে তাকিয়ে সরোজ সহসা ডাকলে—ডেভিড, চট্ করে এসো দিকি, দেখতো সেই অশ্বত্থামা কিনা ?

ডেভিড তখনও ব্যাপারটা ভাল বোঝেনি, স্বপ্নাবিষ্টের মত বিছানার উপর বসেছিল, সরোজের ডাকে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু বারান্দা পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছবার আগেই সরোজের হাতের পিস্তল গর্জ্জন করে উঠলো।

ডেভিড বাইরে এসে দেখলে একটী লোক ধীরে ধীরে সাগরের জলে নেবে যাচ্ছে ! লোকটী একেবারে জলের নীচে তলিয়ে যাবার আগে একটী তীক্ষ্ণ হাসি হেসে তাদের চমকে দিয়ে গেল। ঠিক পর মূহূর্ত্তেই নীচের দরজা দিয়ে বিনয়বাবু ও ডাক্তার রায় পথে বেরুলো। তাদের দেখেই সরোজ উপর থেকে চীৎকার করে ডাকলো।—বিনয় দা ! ডাক্তার বাবু !!

নাম ধরে ডাকতে শুনে বিনয়বাবু ও ডাক্তার রায় মুখ তুলে তাকালে। সরোজ আবার চীৎকার করে উঠলো—বিনয়দা ! ডক্টর রায় !!

বিনয়বাবু ও ডাক্তার রায় উপর দিকে তাকিয়ে থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, যেন সহসা তাদের দু'পা মাটীর সঙ্গে আট্‌কে গেছে !

ডেভিড চীৎকার করে উঠ্‌লো—বিনয়দা, ডক্টর রায়, আমি ডেভিড আপনাদের ডাকছি—

—ডেভিড !

—হ্যাঁ, আমি ডেভিড। আপনারা দুজনে ওপরে উঠে আসুন—

এবার যেন বিনয়বাবুর তন্দ্রা কেটে গেল, 'হ্যাঁ যাই' বলে ডাক্তার রায়ের হাত ধরে তিনি বাড়ীর মধ্যে ঢুকলেন।

সরোজ বললে—ওই তো, অশ্বথামা না?

—কে? যে জলে ডুবে গেল? ও সেই অশ্বথামা? এর মধ্যে এখানে এসে জুটেছে? সেই তান্ত্রিকটা?—ডেভিড জিজ্ঞেস করলে।

—তাই তো দেখলুম। দাঁড়িয়ে ছিল, চোখ দুটী ঠিক তেমনি জ্বলছে বাঘের মত।

—বল কি? তুমি ঠিক দেখেছ?

—হ্যাঁ।

—সমুদ্রে নেবে গেল কোথায়?

—ডুবে ডুবে কোথায় গিয়ে উঠবে কি করে বলি, তবে ডুবে যাবার লোক সে নয়, এ আমি জোর করে বলতে পারি।

ডেভিডের মুখে চিন্তা দেখা দিল, বললে—আজ সবেমাত্র আমরা এখানে এসেছি, এরই মধ্যে সে এলো কেমন করে?

—আমিও তো তাই ভাবছি। গুলি করেছিলুম কিন্তু গুলি লেগেছে কিনা জানি না। খানিকক্ষণ দেখি যদি জল থেকে ওঠে তো এখানেই শেষ করে দোব।

—তোমার কি মনে হয় সে এখানে আবার উঠবে?

—উঁহুঁ।

—আমারও তাই বিশ্বাস।

বিনয়বাবু ও ডাক্তার রায় ততক্ষণে উপরে উঠে এসেছেন। সরোজ জিজ্ঞেস করলে—বিনয়দা, ব্যাপার কি বলুন তো, হঠাৎ আপনারা দুজনে নীচে ছুটে গেলেন কেন ?

বিনয়বাবু শূন্যদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ সরোজের মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন। কি যেন ভুলে গেছেন, ভাল করে মনে করার চেষ্টা করছেন—চোখে মুখে এমনি ভাব। কতক্ষণ পরে বললেন—কি জানি, কিছু তো বুঝলুম না, মনে হোল যেন একটা প্রচণ্ড ঝড়ের টানে কোথায় উড়ে যাচ্ছি, কোন জ্ঞান ছিল না। তারপর যখন তোমার ডাক কানে গেল, তখন দেখি আমি নীচে দাঁড়িয়ে আছি—

কথাগুলি বিনয়বাবু আস্তে আস্তে এমন ভাবে বললেন, যেন বহুদূর থেকে তিনি কথা বলছেন।

সে রাত্রে আর কারুর ঘুম হোল না।

রাত্রির অন্ধকার ফুরিয়ে প্রভাতী আলোর আরম্ভ হোল। অন্ধকারের রহস্য ডুবিয়ে দিয়ে দিনের আলো নিয়ে এল সাহসের বাণী, জীবনের বারতা। যে প্রান্তর এতক্ষণ স্তব্ধ ছিল, সেই তেপান্তরের মাঠে কে যেন বাঁশীর সুর দিল, সাগর-দেবতা তার জলের পটে কত রঙের রেখা ফেললো, কিন্তু রবির চোখ রাঙানিতে সব রং মিলিয়ে গেল, কেউই শেষ পর্য্যন্ত রোদের ঝিলিমিলিতে টিকলো না, মেঘের পর্দ্দা কত করে চেষ্টা করলে

তাদের আড়াল করে রাখার জন্য কিন্তু পারলে না, সব ছাপিয়ে সূর্য্য উঠলো।

বারান্দা থেকে বিনয়বাবু এই রঙের খেলার পানে তাকিয়ে বসে ছিলেন কিন্তু দেখছিলেন বলে মনে হয় না, মন তাঁর কোথায় পড়েছিল, এক সময় বলে উঠলেন—তাইতো এখানেও এমনি হোল ! দেখ সরোজ, আমি কোথায় যাই বলত ?…কি করি ?…রাত্রিতে এমন করে কে ডাকলে ?…কোথায় চলে যাচ্ছিলুম ?…এতদূরে এলুম, তবু এ-ই !

ডাক্তার রায় বললে—শুধু আপনার একার দুঃখই তো নয়, আমিও রয়েছি আপনার সাথা। একবার যখন নিশি-ডেকেছে তখন আবার ডাকবে, এবার রক্ষে পেয়েছি বলে যে এর পরের বারেও রক্ষে পাব তার কোন মানে নেই। তবে যেখানেই যাই, আর যাই হোক্ দুজনকে যখন ডেকেছে তখন দুজনে দিব্যি একসঙ্গে থাকা যাবে।

সরোজ বললে—কিন্তু আমরা আছি কি জন্যে ? আমরা যদি যাবার সুযোগ দি তবে তো যাবেন ?

—'যাবার সুযোগ' মানে ?—আপনারা কি চিরদিন আমাদের পিছনে নেপালী দরোয়ানের মত পিস্তল নিয়ে ঘুরে বেড়াবেন নাকি ?

—আমরা ঘুরবো কেন, আপনারাও পিস্তলের পাশ করিয়ে নিন্—ডেভিড্ বললে।

ডাক্তার রায় বললে—নিশি যখন ডাকে তখন কি আর পিস্তলের কথা মনে থাকে ?

বিনয়বাবু বললেন—পিস্তল দিয়ে সব সময় সব কিছু জয় করা যায় না ডেভিড, মনের জোর কি গুলি-গোলা দিয়ে জয় করা যায় ! তাহলে সেকেন্দর, চৈঙ্গিজ্, তৈমুর, নেপোলিয়ন, কাইজারকে আজও সারা জগৎ পূজো করতো। বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য, বিবেকানন্দ, গান্ধী এদের নাম তাহলে দুনিয়ায় কেউ শুনতো না বুঝলে !

—আপনারা—মানে ভারতের লোকেরা মনকে বেশী বড় করে ভাবতে শিখেছেন, ডেভিড্ বললে, কিন্তু মনের জোরের চেয়ে গায়ের জোর বেশী ! এই যে জার্ম্মাণরা যুদ্ধে হেরে গেল, একি মনের জোরে না গায়ের জোরে, মনে মনে লাখ লাখ লোক বছরের পর বছর ধরে কামনা করলেও জার্ম্মাণদের হারানো যেতো না, তাকে হারানো হয়েছে লড়ে—

—ওই লড়াইয়ের মধ্যেই ছিল মনের জোর। কাইজার য়ুরোপের সম্রাট হবার কামনা করেছিল বলেই না স্মেত লোক লড়লো, কাইজার যদি ওকথা না ভাবতো তো লড়াই বাধ্‌তোই না। বন্দুক, কামান, টর্পেডো—যার কথাই তুমি বল না কেন সবের পিছনে একটা মন আছে নাহলে কামান নিজে গিয়ে তো আর লড়াই করে না, বল ?

ডেভিড বললে—সে কথা আমি বলছি না, আমি বলছি

পিস্তলের জোর ওই তান্ত্রিকের মনের জোরের চেয়ে বড়, আমাদের পিস্তলের গুলি খাবার ভয়েই তো তান্ত্রিক জলে ডুবলো, এই পিস্তলের গুলিতেই আমি ওর শেষ করব্রো—

—বেশ, তা যদি করতে পার, ভালই হয়, আমি তাহলে বাঁচি— বিনয় বাবু বললেন।

—নিশ্চয় করবো, দেখে নেবেন!

ডাক্তার রায় বললে—সে যা হয় পরে হবে, আমি কিন্তু এখানে আর একদিনও থাকবো না। এখানেও যখন সে আমাকে ছাড়েনি, দেখি কদ্দুর সে আমার পিছু নেয়। এখান থেকে যাবো বোম্বে, বোম্বে থেকে রোম, রোম থেকে মস্কো, মস্কো থেকে লণ্ডন, লণ্ডন থেকে নিউইয়র্ক, দেখি ওই অশ্বত্থামা, কি করে আমার পিছনে যায়, ওদেশে একবার দেখলে হয়, তখুনি জেলখানায় পাঠাবে।

বিনয়বাবুর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললেন—ঠিক বলেছ ডাক্তার, আমি যাব তোমার সঙ্গে, আজই যাব—

ডেভিড বললে—আজই যাবেন কেন, দু-একদিন দেখুন, এর মধ্যে যদি সে আবার আসে তাহলেই কেল্লা ফতে—

—না আমি আর এখানে একদিনও থাকবো না।

—কিন্তু আমরা যে একবার কনারক আর ভুবনেশ্বর দেখে যাব মনে করেছিলুম।

—কনারক, সে তো অনেক দূর!

—মাত্র চুয়ান্ন মাইল, মোটরে পৌঁছতে তিনঘন্টা লাগ্‌বে,
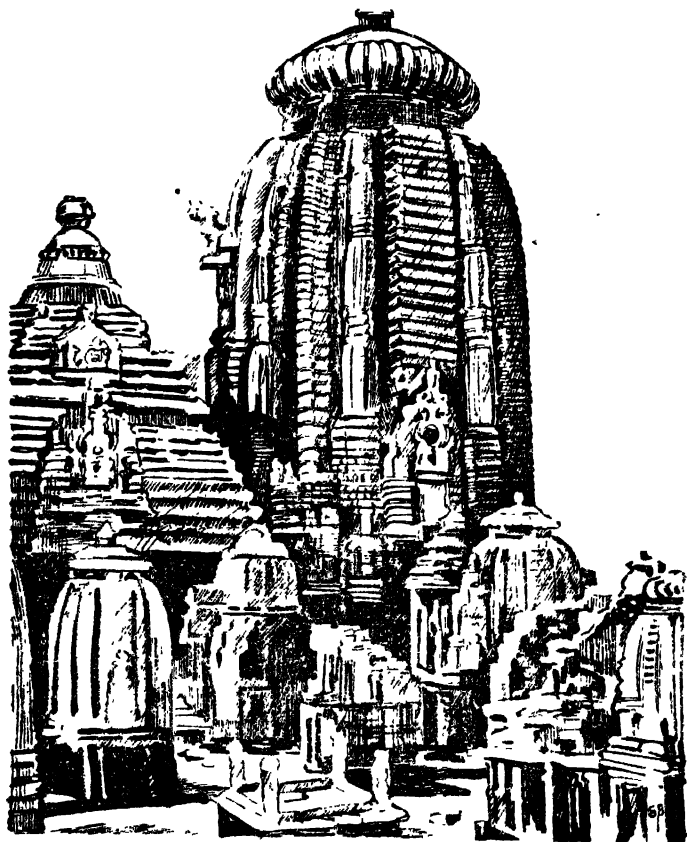
ভুবনেশ্বরের মন্দির

ফিরে আসতে তিনঘন্টা, আর দেখতে ঘন্টা তিনেক—এই মোট ন ঘন্টার ব্যাপার।

—তার মানে, আজকের দিন শেষ। তারপর আবার ভুবনেশ্বর দেখবে তো?

—ভুবনেশ্বর তো যাবার পথেই পড়বে, কিন্তু কনারক না দেখলে, হয়তো আর দেখার সুযোগ না'ও আসতে পারে, অতো প্রাচীন এক সূর্য্য মন্দির, স্থাপত্য আর কারুকার্য্যের খ্যাতি

কনারকের মন্দিরের জগমোহন

শুনে যা দেখতে সুদূর য়ুরোপ থেকেও কত লোক আসে আর আমরা এখানকার লোক হয়ে দেখবো না? তারপর যাবার পথে যদি ভুবনেশ্বর, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি না দেখি, তাহলে তো উড়িষ্যার শিল্প-প্রতিভার সঙ্গে আমাদের পরিচয়ই হোল না, প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধির কথা জানতে হলে উদয়গিরির গুহাচিত্র, রাজরাণীর মন্দির, এসব যে দেখতেই হবে—

—ও সব কিচ্ছু দেখবো না, আমি আজ সন্ধ্যার ট্রেনেই বোম্বে যাবার জন্য বেরিয়ে পড়বো—

বিনয়বাবুকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা গেল না।

মালাবার হিল্স, বোম্বের শ্রেষ্ঠ পল্লী। আরব সাগরের উত্তাল ঢেউগুলিকে ঈর্ষা করে বোম্বের সমতল ভূমি যেন সহসা

উদয়গিরির গুহা

ফুলে উঠে মালাবার পাহাড়ে রূপান্তরিত হয়ে গেল। ঢেউগুলি সেই পাহাড়ের চরণতলে এসে আঘাতের পর আঘাত করছে, চূর্ণ-চূর্ণ হয়ে চারিপাশে কণায় কণায় ছড়িয়ে পড়ছে, প্রস্তরীভূত মাটী দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল হয়ে। সাগর সৈকতের আশে পাশে একটী গাঢ় কৃষ্ণ রেখা সাগর ও ধরণীকে তফাৎ করে দিয়েছে। সেই রেখাটীকেই চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে দেবার জন্য

শাদা শাদা ফেনার পুঞ্জ সৈকতের বুকে এসে জমা হচ্ছে। সামনে শুধু জল আর জল—দূরে বহুদূরে যেন কুহেলী ঢাকা মেঘের মাঝে সেই জলরাশি আপনাকে হারিয়ে ফেলেছে! সেই নীল পর্দ্দার সীমান্তে নিবিড় সবুজ গাছের সারি, তারই পশ্চাদ্-পটে আলোছায়ায় মিশে বোম্বের মায়াপুরী। সেই অপরূপ সুষমাকে বসে বসে নিরীক্ষণ করলে জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তটাকে ভাল করে অনুভব করা যায়, নিজেকে ভুলে মন ছুটে যায় কোন সুদূরের সন্ধানে। পিছনে সুন্দরী নগরী, মাথার উপর মেঘলা আকাশের নীচে সবুজ পাতার মর্ম্মর, সামনের অনন্ত জলরাশি, সব ফেলে মন উধাও হয়ে যায় কোন রূপ স্রষ্টার খোঁজে।

এই সমুদ্রতটে একটী বিখ্যাত হোটেলে পাঁচটী বন্ধু এসে উঠেছে।

কোথায় পুরী আর কোথায় বোম্বাই! বঙ্গোপসাগরের তটভূমি থেকে একেবারে আরব সাগরের তটভূমি। এতদূর নিশ্চয়ই অশ্বত্থামা তাদের পিছনে ছুটে আসেনি, এখানে তবু কিছুদিন নিশ্চিন্ত মনে তারা ঘুমোতে পারবে, ভেবে বিনয়বাবু ও ডাক্তার রায় প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। তখন তারা কেউ জানতো না যে এই রাত্রেই এই চিরচেনা পুরাণো ভারতভূমি ছেড়ে, বোম্বাইয়ের উপকূল ত্যাগ করে, আরব সাগর পার হয়ে বহুদূরে চলে যেতে হবে, সেই যাওয়াই হবে তাদের চিরবিদায়!

*   *   *

রাত তিনটে হবে।

অতবড় হোটেল মৃতের মত স্তব্ধ। আলোর মালা কখন নিভে গেছে, প্রাসাদের ঘরে ঘরে জমে উঠেছে ঘন অন্ধকার। মানুষের সোরগোল, জামাকাপড়ের খস্‌খসানি, 'বয়ের' ছুটো-ছুটি, বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে ঝল্‌মলে হাসি, চাকচিক্যের ঔজ্জ্বল্য —সব ঢাকা দিয়ে রাত্রির প্রহরী স্তব্ধ অন্ধকারের তলোয়ার খুলে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু ভেসে আসছে সাগরের অবিশ্রান্ত ক্রন্দন। বিলাসের নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতার অশান্তি, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অত্যাচার, অন্তরের দৈন্যকে ঢেকে রাখার জন্য বাহিরের চাকচিক্য, জগতের শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষকে পরমেশ্বরের কাছ থেকে কত নীচে, সত্য ন্যায় ও প্রেম থেকে কতদূরে টেনে এনেছে তাই দেখে সাগর উত্তাল হয়ে উঠেছে, কেঁদে কেঁদে ধরিত্রীর কোলে আছড়ে পড়ছে, কেঁদে কেঁদে বলছে—ওরে তোরা পিছনের পানে দেখ্, তোরা মানুষ? ভগবানকে উপলব্ধি কর, ওরে নির্ব্বোধ সামনের পানে কোথায় চলেছিস্ ওসব মিথ্যা!—মিথ্যা!!—মিথ্যা!!!

সাগরের এই অবিরাম ক্রন্দন শুনে মৃত্তিকা-মা রাত্রির অন্ধকারে মুখ ঢেকেছেন।

সহসা—

কি যেন একটা কারণে সরোজের ঘুম ভেঙে গেল, কেমন

যেন বিশ্রী মনে হচ্ছে, সহ্য করা যায় না, যেন বুকের উপর কোন একটা ভার পড়েছে। কি যে হচ্ছে সরোজ ভাল করে কিছুই বুঝলো না, মনে হোল যেন ঘরের মধ্য দিয়ে একটা লোক চলে যাচ্ছে। ভাল করে সরোজ তাকালো—দুটো জ্বল্‌জ্বলে চোখ, শাদা পাকা দাড়ী, মাথায় জটা, দীর্ঘ দেহ…

কে যেন সরোজের দেহের ও মনের সবটুকু শক্তি অপহরণ করে নিলে।

সহসা ডেভিড চীৎকার করে উঠলো—শয়তান! শয়তান!

—মৌনী ভব!!! ঘরের মধ্যে বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হোল।

ডেভিডের গলা থেকে আর স্বর বেরুলো না।

উজ্জ্বল একজোড়া চোখ ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হয়ে গেল। বাহির থেকে দরজা বন্ধ করার শব্দ শোনা গেল। ভিতরের লোকগুলি তখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত রুগীর মত পঙ্গু।

কতক্ষণে যে তারা সুস্থ হয়ে বিছানা থেকে নাব্‌লো তার হিসাব তারা জানে না,—পাঁচ মিনিট হতে পারে একঘণ্টাও হতে পারে। আলো জ্বেলে দেখে—দুটো বিছানা খালি, বিনয়বাবু ও ডাক্তার রায় নেই। পিস্তল নিয়ে তিনজনে নীচে নাব্‌লো পথের এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করলে, পুলিশে খবর দিলে, কিন্তু কিছুই হোল না। বিনয়বাবু ও ডাক্তার রায় যেন বাতাসে উবে গেছে।

সন্ধ্যার আব্‌ছা অন্ধকারে একখানি মালবাহী জাহাজ বোম্বাইয়ের উপকূল থেকে ছাড়লো।

সামনের অসীম নীল জলের বুকে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠছে, আকাশের নীলিমা ও সাগরের নীলাম্বু কোথায় যে মিশে এক হয়ে গেছে আর বোঝা যায় না। উপরে মিট্‌মিটে তারাগুলো দূরের বন্দরের আলোর সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছে! মার্কনী ডেকের উপর থেকে এক যুবক সেই স্তিমিত আলোর পানে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে—জন্মভূমির শেষ প্রান্তের শেষ আলোগুলি তার চোখের সামনে থেকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে, ওই তার জন্মভূমি! কয়েকটা টাকার লোভ দেখিয়ে এই জাহাজখানি জন্মভূমির কোল থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়েছে। ছুটি নেই। জাহাজের গতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের দূরত্ব বাড়বে, এই সমুদ্রের ব্যবধান হয়ে পড়বে অসীম। কয়েকটা রূপার চাক্‌তি দেশের প্রতি তার আকর্ষণটুকু কিনে নিয়েছে, দেশের প্রতি ভালবাসা টাকার মূল্যে বিক্রী হয়ে গেছে। জলের বুকে এই জাহাজখানিই তার কাছে এখন সব। দশ বছরের কন্ট্রাক্টের এখনও ছ'বছর বাকী। এই ছ'বছর সমুদ্রের ঝড়-ঝাপটা উত্তাল তরঙ্গের আঘাত সয়েও যদি সে বাঁচে, তখন তার ছুটি মিলবে। ভারত মায়ের শ্যামল কোলে সবুজ মাটীর বুকে ফিরে আসবে, তার ঘরের পাশে গাছের শাখায় সবুজ পাতায় ঘিরে লাল নীল শাদা ফুল ফুটবে,

সংবাদের কামান আকাশের পানে গর্জন করে উঠল —১৭৫ পৃষ্ঠা

মেঘমেদুর বর্ষার দিনে টুপ্‌টাপ্‌ করে পুকুরের জলে বৃষ্টি পড়বে, মাটীর বুক থেকে একটা ভিজে মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসবে, সবুজ ঘাসের বুকে পায়ের পর পা ফেলে বট অশথের ছায়ায়-ছায়ায় সে ঘুরে বেড়াবে, জ্যোৎস্না রাতে ভেসে যাওয়া মেঘের পানে তাকিয়ে, ঝিরঝিরে দখিনা হাওয়ার সঙ্গে সুর মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়বে—বাংলা মায়ের স্নেহের আঁচলে সে নিজেকে ঘিরে রাখবে! সেখানে ঝড়ের রাত্রে উত্তাল সমুদ্রের তরঙ্গে জাহাজ টল্‌মল্‌ করবে না, ওয়ারলেশের

রবীন্দ্রনাথ

হ্যাণ্ডফোন কানে আটকে বিপদের সঙ্কেত শুনতে হবে না। ডিউটির তাড়া নেই, ক্যাপ্‌টেনের হুকুম নেই,—জীবনটা বেশ কাটবে!

যুবক বোম্বাইয়ের ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসা আলোগুলির পানে তাকিয়ে গুন্‌ গুন্‌ করে গান ধরলো—

এমন দেশটী কোথাও খুঁজে
পাবে নাক তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে
আমার জন্মভূমি···

এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার
কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র
আকাশ তলে মেশে
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায়
বাতাস কাহার দেশে
পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী
কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী
গুঞ্জরিয়া আসে অলি
পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে
ফুলের মধু খেয়ে·········
এমন দেশটী কোথাও খুঁজে
পাবে নাক তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে
আমার জন্মভূমি

পিছনে আরেকটী যুবক কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, সহসা সে কথা বলে প্রথম যুবকটীকে চমকে দিলে। ইংরাজীতে বললে—হ্যালো, অনিল বাবু, দেশ ছাড়তে দুঃখ হচ্ছে,—না?

—না, মিষ্টার জোনস্, অনিল বললে—দেশের জন্য খুব বেশী দুঃখ হয় না, বেঁচে থাকলে একদিন ফিরে তো আসবই। দুঃখ

হয় মায়ের জন্য, বাবা কবে মারা গেছেন এখন আর ভাল করে মনেও পড়ে না, মা-ই ছিলেন আমার জীবনে সব। মা যখন মারা গেলেন, আমি তাঁর একমাত্র ছেলে জাহাজে চাকরী নিয়ে তখন য়ুরোপের সমুদ্র-উপকূলে ঘুরে বেড়াচ্ছি, শেষ দেখাও হোল না। খবর যখন পেলুম, তখন যে হিন্দু প্রথা মত অশৌচ পালনে মাকে একটু শ্রদ্ধা জানাবো—চাকরীর জন্য তা'ও হোল না, চাকরীটাই বড় হোল।—

জোন্‌স্ বললে—আচ্ছা, অনিলবাবু, আপনি তো একা, আপনি এমন চাকরী করছেন কেন? আপনাদের দেশে খাওয়া-দাওয়া তো খুব সস্তা বলে শুনি, দশ টাকা হলেই একটা লোকের বেশ চলে যায়। আপনি একা লোক, এই ক' বছরে উপায়ও তো যথেষ্ট করেছেন, দেশে আপনার জমি জমাও আছে; বেশী টাকার আপনার দরকার কি?

—টাকার দরকার আছে মিস্টার জোন্‌স্; আমার আরেক মা আছেন, তাঁর জন্য টাকা জমাচ্ছি। আর জমিজমা যা বললে সাহেব, তা থেকে কিছুই পাওয়া যায় না। যারা সে জমিতে আবাদ করে তাদের বছরে আট মাস খাবার জোটে না, ম্যালেরিয়ায় ভুগে-ভুগে তারা মরে বেঁচে আছে, তার উপরেও জুলুম করে টাকা আদায় করতে আমি পারি না—চাইও না।

মিস্টার জোন্‌স্ খানিকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইল, তারপর

বললে—আচ্ছা বাবু, আর একজন মা আছে বললেন, সে কি আপনার সৎমা ?

—সৎমা নয় সাহেব, সে-ই আমার বড়মা, আমার দেশ, আমার জন্মভূমি—The Country of beggers ! * আমার সব ভিখারী-ভাইদের জন্য তাই টাকা জমাচ্ছি, সুবিধামত তাদের সেবায় লাগিয়ে দেওয়া যাবে, কি বল !—অনিল হাসলে।

জোন্‌স্ বললে—আচ্ছা বাবু, তোমরা দেশকে এতো ভাল বাসতে শিখলে কোথেকে বলত ?

—তুমি ভুল বুঝেছ সাহেব, দেশকে তো আমরা ভালবাসি না, আমরা ভালবাসি গরীব-দুঃখীদের, দুনিয়ার সব গরীব দুঃখীরা আমাদের ভাই, আমাদের ভগবান ; আমাদের ধর্ম্মে বলে—দরিদ্র নারায়ণ।

—তোমাদের কাছে এখনও অনেক জিনিষ আমাদের শেখার আছে অনিলবাবু—চিন্তিতভাবে জোন্‌স্ বললে ।

—তোমার প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ, মিস্টার জোন্‌স্ ।

—মিছে প্রশংসা নয় অনিল বাবু, ভারতীয়দের সঙ্গে যতই আমার পরিচয় হচ্ছে ততই তা'দের উপর আমার শ্রদ্ধা বাড়ছে ! ...যাক্ সে কথা, তোমার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে,—

* সম্প্রতি বিখ্যাত জাপানী কবি 'ইয়োন্ নগুচি' এ দেশে বেড়াতে এসেছিলেন, এদেশের দারিদ্র্য দেখে তিনি লিখেছিলেন—'Country of beggers.'

—কী ?

—আজকের কাগজ দেখেছ ?

—কেন ?

—এই খবরটা দেখেছ ?—বলে জোন্‌স্‌ সেদিনকার বোম্বে ক্রনিক্‌লের একখানি পাতা অনিলের চোখের সামনে তুলে ধরলে,—ছোট ক' লাইন খবর—

পাঁচ-শো টাকা পুরস্কার

বোম্বায়ের বিখ্যাত তাজমহল হোটেল থেকে দুজন ভদ্রলোক সহসা গতরাত্রে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, কে বা কাহারা কোন দুরভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য তাদের হরণ করে নিয়ে গেছে। যদি কোন লোক তাঁদের সন্ধান দিতে পারেন, তাহলে তাঁকে পাঁচশো টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে, একজনের সন্ধান দিতে পারলেও আড়াই শো টাকা পাবেন।

নীচে দুজনের ফটো দেওয়া হোল।

সন্ধান দেবার ঠিকানা—সরোজকুমার সেন,
তাজমহল হোটেল,
বোম্বাই।

খবরটা পড়ে অনিল জিজ্ঞেস করলে—এর সঙ্গে আমাদের কি দরকার আছে, মিস্টার জোন্‌স্‌ ?

—এই প্রাইজের টাকাটা আমি নোব। ওই লোক দুটী আমাদের এই জাহাজেই আছে।

—অনিল বিস্ময়ে জোন্‌সের মুখের পানে চাইল।

জোন্‌স্‌ বললে—কাল রাত্রে হঠাৎ মাথাটা ধরে ওঠে, ডেকে খানিকক্ষণ বেড়াচ্ছিলুম, এমন সময় মনে হোল কারা যেন কথা বলছে, অথচ দেখলুম ডেকের উপরে আমি ছাড়া কেউই নেই। তবু কথাটা কানে আসছে। সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ালুম সেখানেও কেউ নেই তবে গলার স্বরটা আগের চেয়ে স্পষ্ট বলে মনে হোল। কেমন যেন সন্দেহ হোল। সিঁড়ির নীচের দরজাটা দেখি চাবি দেওয়া, তারই ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখলুম। অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না, তবে তারই ভিতরে যে দুটী লোক কথা বলছে, তা বুঝতে আমার বাকী রইল না। ঠিক সেই সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে চলে এলুম।

—তারপর ?

—তারপর আজ দুপুরে এই খবরটা পড়ে সুবিধা বুঝে ঘরের মধ্যে আরেকবার উঁকি মেরে দেখেছি। দুজন লোক ওই ঘরের মধ্যে লুকিয়ে আছে।

—বল কি ?

—সত্যি। চলনা তোমায় দেখাচ্ছি—

—চল,—অনিল উঠে দাঁড়ালো।

মার্কনী ডেক থেকে দুজনে নেবে এল। সিঁড়ির নীচে একটী ছোট চোরা কুঠরী। দরজাটায় একটা তালা লাগানো

আছে, ঠেলে ধরতেই একটু ফাঁক হয়ে গেল। তার মধ্যে দিয়ে দেখা গেল দুটী লোকের শাদা পরিচ্ছদের অস্পষ্ট আভাস।

অনিল বললে—ওই দুজন?

—হ্যাঁ।

—শুল্ক বিভাগের লোকেরা ধরে নি?

—টাকা, টাকা—টাকা দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করা হয়েছে! ঘুষ দিয়ে ভগবানকেও বশ করা যায়, আর এ তো সামান্য কথা!

—না, একেবারে সামান্য নয়!!

পিছনে জলদগম্ভীর স্বরে কথাগুলি শোনা গেল, দুজনে চমকে উঠে পিছু ফিরে তাকিয়ে দেখে এক দীর্ঘ-দেহী সন্ন্যাসী পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। অমন লম্বা লোক যে থাকতে পারে, চোখে দেখলেও তা বিশ্বাস করা যায় না, মুখের কথা হারিয়ে যায়, চোখ কেঁপে ওঠে, পায়ের জোর কমে যায়!

সন্ন্যাসী বললে—তোমরা পাপ করেছ, তার প্রায়শ্চিত্ত তোমাদের করতেই হবে, এসো আমার সঙ্গে—

—যাব না!—জোন্‌স্‌ প্রতিবাদ করলে।

হাহা করে সন্ন্যাসী হেসে উঠলো, আদেশের স্বরে বললে—এসো!!

কথাটার এমনি আকর্ষণ যে তারা প্রতিবাদ করতে পারলে না, আজ্ঞাবাহী চাকরের মত দুজনে তার পিছু পিছু চললো। তাদের মনে হোল, কে যেন তাদের দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

* * *

ক্যাপ্‌টেনের কেবিন। সন্ন্যাসী সেই কেবিনের আলোর নীচে এসে যখন দাঁড়ালো ক্যাপ্‌টেন জিজ্ঞেস করলে—কী ব্যাপার, সাধুজী ?

—আপনার এই দুজন কর্ম্মচারী আমার উপর গোয়েন্দাগিরি করছে।

—এই দুজন ?

ক্যাপ্‌টেন অনিল ও জোন্‌সের পানে তাকালো।

—হ্যাঁ, এদের একটা বিহিত করুন।

—কি করবো ?

—সাজা দিন !

—সাজা ?—ক্যাপ্‌টেন কেমন যেন ইতস্ততঃ করলে।

—হ্যাঁ, সাজা !!—বলে সন্ন্যাসী ক্যাপ্‌টেনের পানে কঠোর দৃষ্টিতে তাকালো। হিপ্‌নোটিষ্টের মত সে ধারালো চোখের সামনে ক্যাপ্‌টেনের মত বদলে গেল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালে, বললে—অল্ রাইট্, সাজা আমি দিচ্ছি। মেট্, চারজন খালাসীকে ডেকে আন তো।

—খালাসীরা কি করবে স্যার ?—অনিল জিজ্ঞেস করলে।

—Shut up, you blackie nigger !——ক্যাপ্টেন ধমকে উঠলেন।

—আমায় অনর্থক গাল দিও না, ক্যাপ্‌টেন। তোমার

চাকরি করি বলে, আমায় গাল দেবার তোমার কোন অধিকার নেই, আমি তোমার চাকরী থেকে রিজাইন্ (resign) দিচ্ছি, এডেনে পৌঁছলেই আমি তোমার জাহাজ ছেড়ে চলে যাব—

—তোমায় আমি এখুনি জাহাজ ছাড়াচ্ছি, এডেন পর্য্যন্ত আর যেতে হবে না, বলেই ক্যাপ্টেন হাঁক দিলেন—খালাসী !

—হুজুর !!!

জন কয়েক খালাসী এসে তখন দরজার সামনে জড় হয়েছে, আদেশ শোনার অপেক্ষায় তারা তটস্থ হয়ে দাঁড়ালো।

—এই কালা নিগারকো পাক্ড়ো।

ক্যাপ্টেন অনিলকে দেখিয়ে দিলে।

অনিল রুখে দাঁড়ালো, হাত পা নেড়ে শাসিয়ে বললে—খবর্দ্দার ক্যাপ্টেন !

ক্যাপ্টেন সেদিকপানে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে খালাসীদের ধমকে উঠলো—জল্দি এ' কালা কুত্তাকো পাক্ড়ো !

অনিল চিৎকার করে উঠলো—Shut up you red monkey !

—কী ! কি বললে !!—ক্যাপ্টেন ঘুসি বাগিয়ে অনিলের দিকে এগিয়ে এল !

জোন্স্ তাড়াতাড়ি দুজনের মাঝে এসে পড়লো, বললে—ক্যাপ্টেন তুমি কি পাগল হলে নাকি ? এ তোমার অধীনে চাকরী করে, আর একে তুমি খুন করবে !

—ওকে আমি খুনই করবো, ও আমাকে অপমান করেছে, —আমি জার্মান, আমি পরাধীন দেশের একটী কালো কুত্তার অপমান সইব !

—কিন্তু অনিলের দোষ কি, ক্যাপটেন ?

—দোষ কি, বটে ! দোষ তবে কি আমার ?

—তার মানে ? তোমরা মানুষ গুম্ করে রাখবে আর আমি জানলে হবে আমার দোষ !—অনিল বললে।

—নিশ্চয়ই। আর সেই দোষের জন্য আমি তোমায় পাগলা কুকুরের মত গুলি করে মারবো,—বলে ক্যাপ্টেন ফস্ করে ড্রয়ার খুলে পিস্তল বার করে অনিলকে গুলি করলো।

গুলি খেয়েই অনিল পড়ে গেল, দেখতে দেখতে পাঁজরের একটী জায়গা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটে জামাটা লাল করে দিলে, আর তারই সঙ্গে সুরু হোল অনিলের সে-কি নিদারুণ পা ছোড়া !

—কি করলে ক্যাপ্টেন,—কি করলে !!—বলে জোন্স্ ব্যাকুলভাবে বন্ধুর পাশে বসে পড়লো।

হাহা করে ক্যাপ্টেন হেসে উঠলো, বললে—ঠিক করেছি। কালা, ব্ল্যাকি, নিগারকে ঠিক যোগ্য সাজা দিয়েছি !—খালাসী, ইস্‌কো দরিয়ামে ফিকো—

খালাসীরা আহত অনিলকে জলে ফেলতে ইতস্ততঃ করছে

দেখে ক্যাপ্‌টেন গর্জ্জন করে উঠলো—শীগ্‌গির ওকে জলে ফেলে দাও, না হলে তোমাদেরকেও আমি অম্‌নি কুকুরের মত গুলি করে মারবো—

প্রাণের দায়ে খালাসীরা অনিলকে সেই অবস্থাতে সমুদ্রে ফেলে দেবার উদ্যোগ করলো, জোন্‌স্‌ বাধা দিতে গেল, কিন্তু চারজন জোয়ান খালাসীর সঙ্গে পেরে উঠবে কেন! অনিলের আহত মূর্চ্ছিতপ্রায় দেহটা ডেকের উপর থেকে তারা ছুড়ে জলে ফেলে দিলে, রাত্রির অন্ধকারে কালো জলের বুকে সে দেহ কোথায় তলিয়ে গেল, কে জানে!·········

সন্ন্যাসী আবার বজ্রগম্ভীর স্বরে ডাকলে—ক্যাপ্‌টেন্‌!

—কি?

—আরেক জনের শাস্তি?

—কার?

সন্ন্যাসী জোন্‌স্‌কে দেখিয়ে দিলে।

মুহ্যমান জোন্‌স্‌ সচকিত হয়ে উঠলো, বললে—আমি?

সন্ন্যাসী কঠোর স্বরে বললে—হ্যাঁ তুমি!!

ইলেক্‌ট্রিকের শক্‌ লাগার মত জোন্‌স্‌ লাফিয়ে উঠলো, তারপরেই ছুটল নিজের ঘরের দিকে। সে পালিয়ে যাচ্ছে মনে করে ক্যাপ্‌টেন ডাকলো—খালাসী, উস্‌কো পাকড়ো—

কিন্তু খালাসীরা ছুটে গিয়ে ধরার আগেই জোন্‌স্‌ নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো, বেরিয়ে এল একহাতে একটা পিস্তল উঁচু

করে ধরে। বললে—আমার কাছে কেউ এলে তাকেই আমি খুন করবো, সাবধান!

খালাসীরা সয়ে দাঁড়ালো, তরতর করে জোন্‌স্ এসে দাঁড়ালো ক্যাপ্‌টেনের সামনে। একহাতে বুকের জামার বোতামগুলো খুলে দিয়ে বললে—আমি তৈরী, তুমি আমায় কি সাজা দেবে দাও। কিন্তু মনে রেখো তোমাকেও আমি সাজা দেব, আমার বন্ধুকে তুমি খুন করেছ, তুমি হত্যাকারী!

ক্যাপ্‌টেন চিৎকার করে উঠলো—খালাসী!!

জোন্‌স্‌ও পিস্তল বাগিয়ে ধরে বললে—দেখি কোন খালাসী আমার গায়ে হাত দেয়!

খালাসীরা কেউই এগিয়ে এল না, তাদের কারুরই গুলি খাবার ইচ্ছা ছিল না।

জোন্‌স্ বিদ্রূপের হাসি হেসে, নিজের বেতার ঘরের দিকে চলে গেল, সন্ন্যাসীর দিকে চেয়ে বলে গেল—শয়তানকে শায়েস্তা করতে আমি জানি!

বেতার ঘরের দরজা বন্ধ করে কানে হেড্‌ ফোনটা ধরে নিয়ে জোন্‌স্ টেলিগ্রাফ কলের সামনে বসলো। তারপরেই সুরু হোল আঙুলের খেলা—টক্কা টরে···টরে টক্কা—

—টক্কা টক্কা টরে—টক্কা টরে টরে—

বোম্বের জাহাজ আফিসে বেতার গ্রাহক যন্ত্রে খবর এসে পৌঁছলো—

Ocean Kaisar ship···

Arabian Sea···

Two Bengalee lost in Bombay, found in a cell,··· captives of a Sannyasi,···rescue possible at Aden···

[ওসেন্ কাইজার জাহাজ···

আরব সাগর···

বোম্বে থেকে নিরুদ্দিষ্ট বাঙালী যুবক দুজনকে দেখা গেছে, একটী ছোট ঘরের মধ্যে,···এক সন্ন্যাসীর বন্দী···পরবর্ত্তী বন্দর এডেনে তাদের উদ্ধার করা সম্ভব]।

পরদিন সকালে ইম্পিরিয়াল এয়ার ওয়েজের পথে আরব সাগরের উপর দিয়ে একখানি যাত্রীবাহী প্লেন উড়ে যেতে দেখা গেল। তার ভিতরে আমাদের পরিচিত তিনটী মুখ, সরোজ, ডেভিড ও রবিদত্ত।

বহুদিন প্লেনে চড়া হয়নি। কাণচাপা টুপী ভেদ করে প্রপেলারের গর্জ্জন মৃদুস্বরে কাণের পর্দ্দায় এসে আঘাত করছিল—যেন কতদূরে দক্ষিণ হাওয়ায় হারিয়ে যাওয়া গানের রেশ, যুদ্ধের দামামার ঘুম-পাড়ানি ধ্বনি।

প্রায় দু হাজার ফিট ওপর দিয়ে প্লেন ছুটছে, একটা ক্ষুধার্ত্ত ঈগল পাখীর মত ধারালো গতিতে—মাথার উপরে অনন্ত আকাশ, পায়ের নীচে মখমলের মত জল। আকাশের আর

জলের অসীমতায় চারি দিকের দিগ্বলয় হারিয়ে গেছে। ওই মখ্‌মলের গভীরতার নীচে অসংখ্য ভয়াবহ হাঙর, কুমীর, অক্টোপাশ যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা আর বিশ্বাস করতে মন চায় না। এই অনন্ত অসীমতার মধ্যে মনে জাগে শুধু অসহায় ভাব,—এই অনন্ত শূন্যের বুকে আমরা কত একা! এই প্লেন-খানি প্রকৃতির বুকে কত দুর্ব্বল, একটা রুদ্র ঝড়ের ঝাপ্‌টায় এর উপর মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে, অনন্ত কালের বুকে অবলুপ্ত হয়ে যাবে এর ধ্বংস কাহিনী।

—এরোপ্লেন ছুটছে—

নীল ভেলভেটের উপর কালো ধোঁয়ার রেখা টেনে ছুটে চলেছে তিনখানি জাহাজ, উপর থেকে খেলাঘরের জাহাজ বলে ভুল হয়। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় নীল আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ পুঞ্জীভূত হচ্ছে পেঁজা তূলার মত, প্লেনের উপরে ও নীচ দিয়ে তারা ভেসে যাচ্ছে পিছনের দিকে। টুকরো টুকরো মেঘছড়ানো নীল আকাশ, তিনখানি জাহাজ সাজানো, মখ্‌মলের সমুদ্র, দিগ্বলয়ের একটা সরু কালো রেখাকে ঘিরে থম থম করছে,—এতটুকু প্রাণের স্পন্দন নেই, জীবনের সাড়া নেই. এ যেন মৃত্যুপুরী। শুধু সজীব জগতের তিনটী মানুষ এরোপ্লেনের সাড়া তুলে ছুটে চলেছে বাড়ী ঘর, গাড়ী ঘোড়া, খেত খামার ছাড়িয়ে মহামৃত্যুর দেশে চারিদিকে ঘিরে ধরেছে মৃত্যুর শূন্যতা, মৃত্যুর স্তব্ধতা।

বন্ বন্—বন্ বন্ করে প্রপেলার ঘুরছে, প্লেন ছুটছে—

ক্রমে ক্রমে সমুদ্রের নীল আঁচল ফুরিয়ে ধূসর মাটীর সীমা ফুটে উঠ্লো। সাগরের বিরাট নীলিমাকে সহসা যেন বালির পাঁচিল দিয়ে আটকে ফেলা হোল। সেই ধূসর বালির বুক চিরে পাহাড়ের পর পাহাড়ের সারি মাথা তুলেছে! সাগরের বিরাট দেহ দুদিকের পাহাড়ের পীড়নে ক্ষীণ হয়ে গেছে। সেই ক্ষীণদেহকে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য রুদ্ধ আক্রোশে আরব ও আবিসিনিয়ার বুকে বার বার আঘাত করছে, কিন্তু পাহাড়ের পাথরের মন সে আবেগে এতটুকু টলছে না। জলের বুকে শাদা শাদা পাল তুলে নৌকোগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে, এক একটা শাদা বকের মত; পালগুলি ফেনিল জলের বুকে যেন একটা বড় বড় বুদ্বুদ। সেগুলোকে পিছনে ফেলে প্লেন এগিয়ে গেল; বন্দরের পিছনে এক মাঠে এসে প্লেন নাবলো। মরুভূর ধূসরতাকে মুছে ফেলার জন্য মাঠের বুকে সবুজ গাছপালা গজিয়ে উঠেছে, কিন্তু তার পিছনে আবার সেই ধূসরতা। পিছনে নীল অনুর্ব্বর সমুদ্র, সামনে ধূসর অনুর্ব্বর মরুভূমি।

একটা নিবে-যাওয়া আগ্নেয়গিরির উপর এডেন সহর। বন্দর থেকে পাহাড়ী পথ ধীরে ধীরে উপরে উঠে গেছে। শেষে এক গিরিসঙ্কটের মুখে সহরে প্রবেশ করার দরজা, ফটক পার হলেই মাথাপিছু আট আনা পয়সা দিতে হবে। ফটকের দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে বন্দুকধারী শান্ত্রী, আর তারই পিছন দিয়ে চলে

গেছে কেল্লার পাঁচিল। লোকের বসতি এখানে যা আছে, তার চেয়েও বেশী আছে গুলি গোলা কামান আর নানা যুদ্ধের উপকরণ। ভারতে আসার পথে এটীকে একটা দরজা বললেই হয়, এখান থেকে মুক্তি না পেলে সহজে কারুর ভারতে আসার উপায় নেই, তাই এই মরুভূমির বুকেও এতো জল-কষ্টেও ইংরাজদের এতো আয়োজন।

সহরের ভিতরটায় আর গাছপালা দেখার উপায় নেই। সমস্ত সহরটা শুধু পাথরের গুঁড়ো আর টুকরোয় ভর্ত্তি, আর সেই সহরের শোভা বৃদ্ধি করে উঁচু উঁচু পিঠ তুলে উট ঘুরে বেড়াচ্ছে, বোঝা বইছে, গাড়ী টানছে, মানুষকে পিঠে চড়িয়ে ঘুরছে। বাড়ীর রঙও উট আর মরুভূমির সঙ্গে রঙ মিলিয়ে ধূসর করা হয়েছে। মাঝে মাঝে দু-একখানা বিভিন্ন রঙের মোটার গাড়ী এই ধূসরতার ছন্দ ভেঙে দিচ্ছে। শ্যামল বাংলার ছেলের দৃষ্টি মরুভূমির এই প্রখর রুক্ষতা সইতে পারে না।

আরবের সীমান্তে কেল্লাময় ছোট সহর এই এডেন, কিন্তু আরবের লম্বা চওড়া সুপুরুষ বেদুইন এখানে দেখা যায় না। দেখা যায় কালো কালো সাধারণ লোক, দিব্যি আরামে বসে বসে গড়গড়া টানছে।

অমন সহরে থাকতে আর কার ভাল লাগে, কিন্তু না থেকেও উপায় নেই, এখনও 'ওসেন কাইজার' জাহাজ এসে

বন্দরে লাগতে দুদিন দেরী, এই দুদিন এখানে থাকতে হবেই। হোটেলে গাইড্ এসে ধরলো, সহর দেখাবে—

প্রথমে নিয়ে গেল জলের চৌবাচ্চা দেখাতে। পাহাড়ের গা ধরে একটী ঝর্ণা নেবে আস্‌ছে, তার জলকে বেঁধে রাখার জন্য এক বিরাট চৌবাচ্চা, তার নীচে ঢালু পাহাড়ের গায়ে দ্বিতীয় চৌবাচ্চা, তার নীচে তৃতীয়···পর পর শুধু চৌবাচ্চার সারি নেমে এসেছে। প্রথম চৌবাচ্চা ভর্ত্তি হয়ে উপছে পড়ে দ্বিতীয় চৌবাচ্চা ভর্ত্তি করে, তারপরে তৃতীয়, তৃতীয় থেকে চতুর্থ···এমনি ভাবেই চলে। এই জল সমগ্র সহরের প্রাণ। জলহীন দেশে এই জলের চৌবাচ্চাই একটা বিশেষ দর্শনীয় বস্তু। বাংলার বন্যার জলে ডুবুডুবু গাঁ, ভাদ্রের দুকূল-প্লাবি ভরা নদী, পাড় ডোবানো পানাভরা পুকুর দেখে-দেখে যারা অভ্যস্ত, তাদের চোখে এই জলভরা চৌবাচ্চা সুন্দর হয়ে ধরা দেয় না।

গাইড্ বল্‌লে—চলুন মিউজিয়ামে—

সরোজ বল্‌লে—না, আজ থাক, আরেক দিন হবে।

চৌবাচ্চার পর মিউজিয়াম দেখার আগ্রহ সরোজদের আর থাকে না।

দুদিন পরে 'ওসেন কাইজার' এডেনের বন্দরে এসে নোঙর করলো।

ডেভিড, সরোজ ও রবিদত্ত জল পুলিশের নৌকায় প্রতীক্ষা করছিল, ক'মিনিটের মধ্যেই জাহাজে গিয়ে উঠলো। ক্যাপ্টেন কিছুই বললে না, প্রত্যেক জাহাজই বন্দরে ভিড়লে পুলিশের তল্লাস করার নিয়ম আছে। সমস্ত জাহাজখানি সকলে মিলে খুঁজে ফেললে, কিন্তু বিনয়বাবু কি ডাক্তার রায়ের কোন হদিসই পাওয়া গেল না। তবে কি কোন লোক মিথ্যা কেব্ল্ করে তাদের খানিকটা হয়রাণ করলে?

ক্যাপ্টেন হাস্‌লে, উপহাস করে বললে—আমরা ভারতবাসী নয় বাবু, যে টাকা ঘুষ নিয়ে জাহাজে করে মানুষ চালান দেব—

সরোজ জবাব দিলে—খুব সত্যি কথা! এই সেদিন পর্য্যন্ত আফ্রিকার হাজার-হাজার নিগ্রোকে রাতারাতি লুঠ করে জাহাজে শিকল দিয়ে বেঁধে নিয়ে এসে য়ুরোপ আর আমেরিকার বাজারে আমরাই তো বিক্রী করেছি।*

—তাতে তাদের উপকারই হয়েছে, তারা লেখাপড়া শিখেছে, আজ মানুষ হয়েছে···

—নিশ্চয়—তোমরা তাদের যেভাবে মানুষ করেছ, তা 'টম্‌কাকার কুটীর' পড়লেই বেশ বুঝতে পারি!

* ক্রীতদাসের ব্যবসায় কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত য়ুরোপের ও আমেরিকার প্রধান ব্যবসা ছিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে আব্রাহাম্ লিনকলনের ঘোষণায় দাস প্রথার উচ্ছেদ হয়, প্রথম ইংরাজ দাস ব্যবসায়ী 'জন হকিন্স'কে রাণী এলিজাবেথ নাইট্ উপাধি দিয়েছিলেন।

—কালা আদ্‌মির সঙ্গে তর্ক করার আমার মোটেই ইচ্ছা নেই,—বলে সাহেব গট্‌গট্‌ করে নিজের কেবিনে গিয়ে ঢুকলো।

অপমানে সরোজের মুখ তখন লাল হয়ে উঠেছে। শুধু গায়ের রংটা কালো হয়েছে বলেই তাদের এমনভাবে অপমানিত হতে হবে!

ভারাক্রান্ত মনে তিনবন্ধু জাহাজ থেকে নেবে আসছিল, সহসা চীৎকার কানে এল—এবার তোমায় গুলি করবো ক্যাপ্‌টেন!

দ্বারটা অত্যন্ত কাছে, মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলে পিছনে ফিরলো, —কেউ নেই, কে তবে কথা বললে?

সরোজ ডেভিডের মুখের পানে চাইলে, ডেভিড্‌ বললে—শুনেছি, ক্যাপ্‌টেনের ঘরেই বোধ হয় কোন গণ্ডগোল বেধেছে—

—উঁহু, সরোজ মাথা নাড়লে,—ক্যাপ্‌টেনের ঘর ওই ওখানে, ওখান থেকে কি আর এত জোরে কথা শোনা যায়?

ইতিমধ্যে ক্যাপ্‌টেন্‌ এসে হাজির, বললে—আপনারা এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছেন?

—কে একজন আপনাকে গুলি করতে চায় শুনলুম, তাই—সরোজ বললে।

—ওঃ! ওসব বাজে···ক্যাপ্‌টেন্‌ হেসেই উড়িয়ে দিলেন।

—বাজে !—বাজে মানে ?—ক্যাপ্‌টেনের কথায় বাধা দিয়ে সেই অদৃশ্য কণ্ঠস্বর আবার ধ্বনিত হয়ে উঠলো—এখান থেকে একবার বেরুতে পারলে, তোমায় আমি দেখে নেব !

সরোজ জোর গলায় জিজ্ঞেস করলে—আপনি কে ?

—আমি মিস্টার জোন্‌স, এই জাহাজের ওয়ারলেশ্‌ অপারেটার···

ক্যাপ্‌টেন তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—ও একটা পাগল··· ওর কথায় আপনারা কান দেবেন না !

—বটে, আমি পাগল, তাই আমাকে অন্যায় ভাবে এখানে এমনি করে আটকে রেখেছ ! সেই অদৃশ্য স্বর শোনা গেল।

ইন্সপেক্টার গর্জ্জন করে উঠলো—ক্যাপ্‌টেন !

ক্যাপ্‌টেনের মুখখানি তখন ভয়ে শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে, তথাপি, অত্যন্ত সহজ সুরে সে বললে—আমি সত্যিই বলছি ও পাগল—

—হোক পাগল, তুমি ওকে কোথায় আটকে রেখেছ ?—ইন্সপেক্টার জিজ্ঞেস্‌ করলে।

সরোজ বললে—পাগলকে তুমি আটকে রাখবে কেন ? তাকে পাগলা গারদে পাঠাবার ব্যবস্থা কর—

—তাই করবো—ক্যাপ্‌টেন বললে।

সে করবে, পরে কোর, এখন তাকে আমাদের কাছে নিয়ে এসো দিকি—সরোজ বললে।

তথাপি ক্যাপ্‌টেন্ ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যাবার জন্য বললে —কিন্তু সে মারাত্মক রকমের পাগল, আপনাদের কাম্‌ড়ে দিতে পারে…

—তা হোক্, তুমি তাকে নিয়ে এসো—ইন্সপেক্টার বললে।
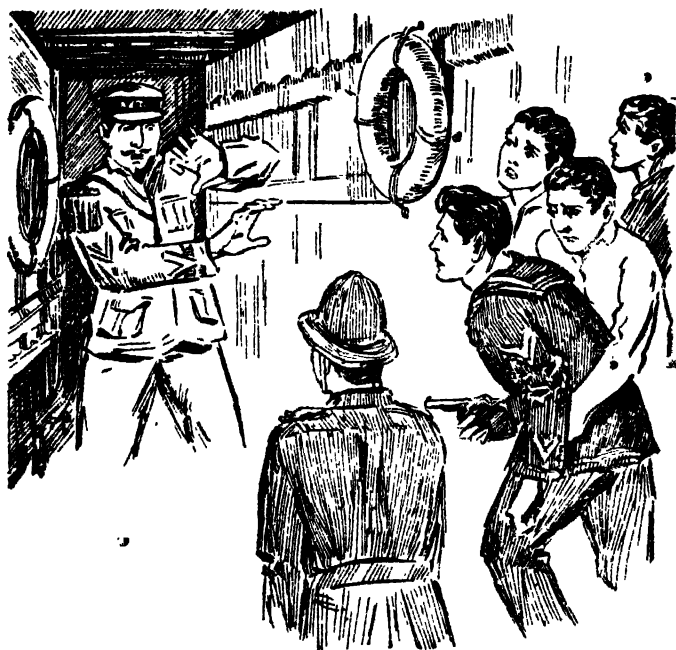
নিরুপায় ক্যাপ্‌টেন্ শেষে সিঁড়ির নীচে একটি গুপ্ত দরজা খুলে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ালো, দরজা খোলা পেয়েই একটী যুবক এক লাফে বাইরে বেরিয়ে এল, হাতে তার পিস্তল,

উস্কো খুস্কো চুল, রুক্ষ চেহারা, বিবর্ণ পোষাক। বাইরে এসেই বললে—কোথায় গেল ক্যাপ্‌টেন্? আমি তাকে কুকুরের মত গুলি করবো—

ছিট্‌কে সে ক্যাপ্‌টেনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, সরোজ তার একটি হাত ধরলে হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে জোন্‌স্ বললে—আপনি হাত ছেড়ে দিন আমি একবার ক্যাপ্‌টেন্‌কে দেখেনি ও আমার বন্ধুকে খুন করেছে, আমি আজ তার শোধ নেব ব্যাটা পাকা শয়তান!

—কি ব্যাপারটা কি, খুলে বলুন তো, আমরা পুলিশের লোক,—সরোজ বললে।

—আমার বন্ধুকে খুন করেছে মশাই,—পাগলা কুকুরের মত গুলি করে মেরেছে,—উত্তেজিত কণ্ঠে জোন্‌স্ বলতে লাগলো —এক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে টাকা ঘুষ খেয়ে দুটো লোককে জাহাজে গুম্ করে রেখেছিল, আমরা জানতে পেরেছিলুম—এই আমাদের অপরাধ!

—সেই লোক দুটী কোথায় গেল বলুন তো?—সরোজ জিজ্ঞেস করলে।

—তা জানে এই ক্যাপটেন। জাহাজ বন্দরে ভেড়ার আগেই ও তাদের সরিয়ে দিয়েছে—

ইন্সপেক্টার তখুনি ক্যাপ্‌টেন ও মেট দুজনকে গ্রেপ্তার করলে।

কিন্তু তাদের মুখ থেকে কথা বা'র করা ভারী শক্ত। শেষে মেটদের একজনকে টাকার লোভ দেখাতে সে সব বলে ফেললে —জাহাজ বন্দরে ভেড়ার অনেক আগে ষ্টীমলঞ্চে সন্ন্যাসী ও তার লোক দু'জন' পালিয়ে গেছে। এপারে তারা যায় নি, গেছে ওপারের দিকে। এপারে ধরা পড়ার ভয় আছে।

এডেনের ও-পার মানে আবিসিনিয়া।

মেটের কথা অন্ধকারে তবু খানিকটা আলো দেখিয়ে দিলে! ওপারে যাবার জন্য খানিকক্ষণ পরেই তারা একটী লঞ্চ ভাড়া করলে।

বন্দরে নাবা হোল না, কেন না তাহলেই পাসপোর্ট চাই, যুদ্ধের সময় আবিসিনিয়া যাবার পাসপোর্ট পাওয়াও সহজ নয়, তাছাড়া এর জন্যে সরোজরা দেরী করতে পারছিল না।

লোকের চোখকে ধূলো দেবার জন্য তাদের লঞ্চ গিয়ে ভিড়লো জিবুতি বন্দর থেকে অনেক দূরে।

সাগরতটের বালির সীমানা পার হয়ে গেলে দু-পাঁচটা গাছ-পালা চোখে পড়ে, তার পিছনে বালির ধূসরতা আর পাহাড়ের প্রাচীর। চোখের দৃষ্টিকে বন্দী করে রাখা সহরের লাল নীল শাদা ও ফ্যাকাশে রঙের বাড়ীর দেয়াল থেকে হঠাৎ মুক্তি পেয়ে চোখের দৃষ্টি বাহিরের পানে এগিয়ে যায়—সবুজ গাছ-পালার পিছনে পাহাড়ের আবছায়া, মাথার উপর নীল মেঘলা

আকাশ, পিছনে নীল উদার সমুদ্র, এরই বুক চিরে মাঝে মাঝে অচেনা পাখীর কাকলি ভেসে আসে। যুগযুগান্তর ধরে ধ্যানমগ্ন ঋষির মত এই প্রকৃতির কোলে বসে থাকতে ইচ্ছা করে। রেডিওর সঙ্গীত, ফিল্মের আলোর খেলা, এরোপ্লেনের গতি, মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব কিছু সম্পদ, এই প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের কাছে ম্লান হয়ে যায়।

গাইডকে সঙ্গে নিয়ে সরোজ, ডেভিড ও রবিদত্ত সমুদ্রের তটরেখা ধরে এগিয়ে চলে······

তৃতীয় দিনে তারা এক গ্রামে এসে পৌঁছাল। সন্ন্যাসীর কথা জিজ্ঞাসা করতে গ্রামের ক'জন জেলে খবর দিলে—অমনি একটা লোককে তারা দেখেছে বটে, দুদিন আগে এক সন্ধ্যায় ওই পাহাড়টার দিকে সে যাচ্ছিল, তার সঙ্গে দুজন লোকও ছিল বটে।···লোকটাকে দেখে তাদের ভয় হয়েছিল, অমন ধরণের লোক তারা জীবনে দেখেনি···ইত্যাদি···যাত্রীর গতি বদলে গেল, তারা চললো পাহাড়ের দিকে।

পাহাড়টা খুব দূরে নয়, আশা ছিল সন্ধ্যার আগেই পৌঁছাবে কিন্তু তা আর হোল না, তার অনেক আগেই উঠলো ঝড়। কোথাও এতটুকু আশ্রয় পাবার উপায় নেই, ফাঁকা প্রান্তর··· তেপান্তরের মাঠ। উদ্দাম বাতাসের সামনে দাঁড়ানো ছাড়া উপায় নেই। শোঁ শোঁ করে বাতাস ছুটছে, ধূলো বালি কাঁকরের

কণাগুলো সেই বাতাসের মুখে ছুটে আসছে, আশেপাশে সামনে-পিছনে ছড়িয়ে পড়ছে—দৃষ্টি চলে না, কাণেও কিছু শোনা যায় না। এক একটী ঝাপটায় রাশি রাশি ধূলো বালি চোখে, কাণে নাকে এসে ঢুকছে, ছোট ছোট পাথরের টুকরোগুলো গায়ে এসে বিঁধছে—অসহ্য ঝড়, মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ। ঝড়ের দাপট্ ক্রমে-ক্রমে বেড়েই চললো। একটী প্রচণ্ড আঘাতে তাদের মাটীতে ফেলে দিলে, আর উঠে দাঁড়াতে হোল না। দেখতে দেখতে কাপড় জামার উপর বালি জমে উঠলো, বালিতে বালিতে চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেল, চোখ খুলে চাইবার উপায় রইল না।—সুদূর মৃত্যুর প্রতীক্ষা! এই মাঠের মধ্যেই তাদের কবর হবে, কোনদিন কোন লোক জানবেও না—অজ্ঞাত, অখ্যাত, অবজ্ঞাত মৃত্যু···

ঝড়ের আঘাতে ধূলো বালির অন্ধকার ধীরে ধীরে তাদের মন থেকে সব মুছে দিলে······

তেপান্তরের বালির নীচে চারটি মানুষ পড়ে রইল।

সরোজ চোখ খুলে দেখে আলাদিনের স্বপ্ন : আকাশের মত অসীম, ধূসর বালিময় অনুর্ব্বর প্রান্তর কোথায় মিলিয়ে গেছে তার মাঝে আরব্য উপন্যাসের মত জেগে উঠেছে চমৎকার নরম বিছানা, মৃদু আতরের গন্ধ, কয়েকটী সবুজ গাছের টব, চারিপাশে লতাপাতা আঁকা সৌখীন পর্দ্দা। আবিসিনিয়ার তেপান্তরের

বুকে এ সে কোথায় এল? সব-কিছুই একটা বিস্ময়কর রূপ-কথার মত সরোজের মনে হোল।

এমন সময় একটি লোক ঘরের মধ্যে ঢুকলো। তার পরণে আজানুলম্বিত এক আলখাল্লা, মাথায় একটি ফিতে জড়ানো,

গায়ের রংটা রোদে-পোড়া তামাটে, প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে পারা যায়, লোকটী বেদুইন। ধীরে ধীরে সরোজের কাছে এসে নিরীক্ষণ করে সরোজের মুখের পানে তাকিয়ে নিজের কাঁচা পাকা দাড়িতে দুবার হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলে, ইংরাজীতেই জিজ্ঞেস করলে—আপনার ঘুম ভেঙেছে ?

সরোজ বল্লে—হ্যাঁ। এটী বুঝি আপনার বাড়ী ?

—বাড়ী নয়, তাঁবু।

—আপনি ?

—বেদুইন। আমার নাম শেখ্ ইস্‌মাইল্। আমার লোকেরা আপনাকে ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ড থেকে কুড়িয়ে এনেছে।

—শুধু আমায় কুড়িয়ে এনেছে ? আমার যে আরো তিনজন সঙ্গী ছিল ?

—সকলকেই আমরা এনেছি।

—তারা কোথায় আছে ?

—অন্য তাঁবুতে।

—তাদের সঙ্গে আমি দেখা করবো।

—না, তাদের সঙ্গে তোমার দেখা হবে না, তুমি এখন ঘুমোও।

—কিন্তু তাদের সঙ্গে দেখা না হলে তো আমার ঘুম হবে না।

—বন্দীদের মধ্যে পরস্পরের দেখা করার নিয়ম নেই।

—আমি তবে বন্দী ?

শেখ সে কথার কোন জবাব দিলে না, ধীর পদক্ষেপে তাঁবুর বাহিরে চলে গেল।

কতক্ষণ সরোজ চুপ করে বিছানার উপর পড়ে রইল। তাঁবুর বাইরে দৃষ্টি যাবার মত এতটুকু ফাঁক নেই। পর্দ্দার গায়ে যেখানে একটু আধটু জানালার মত কাটা আছে সেখানেই সৌখীন সবুজ পর্দ্দা দিয়ে ঘেরা। বাতাসের এক-একটা ঝাপটায় পর্দ্দাগুলো ফুলে ফুলে উঠছে, তারই ফাঁকে বাহিরের মুক্ত আকাশের খানিকটা চোখে পড়ে যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে সরোজ ভাবছিল, তার তিনটী সঙ্গীকে এমনি আলাদা-আলাদা তাঁবুতে রাখা হয়েছে,—তারা বেদুইনের হাতে বন্দী।

বন্দী ! বন্দী !! বন্দী !!!—কথাটা মনে তোলাপাড়া করতে করতে সরোজ বিছানার উপর উঠে বসলো। তাঁবুর যে দরজা দিয়ে শেখ বেরিয়ে গিয়েছিল, বিছানা থেকে নেবে সেই দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, এক হাতে ঠেলে সরিয়ে দিলে পর্দ্দাখানি। পর্দ্দাখানি সরিয়ে দিতেই বন্দুকধারী এক বেদুইন যুবক সেলাম করে সরোজের পথ রোধ করে দাঁড়ালো। সরোজ একটু অপ্রস্তুত হোল, কিন্তু তখুনি মনের ভাবটা গোপন করার জন্য, ইশারা করে জানালো, খেতে চাই—খাবার—

শাস্ত্রী তখুনি একজনকে ডেকে কি বলে দিলে, নিজে কিন্তু দরজা ছেড়ে এতটুকু সরলো না। একটু পরেই সে লোকটী খাবার নিয়ে এল, কিন্তু সরোজের তখন খাবার ইচ্ছা বিশেষ ছিল না। অপরিচিত দেশের অজানা এক বেদুইনের তাঁবুতে সে বন্দী—এই কথাটী কাঁটার মত তার মনে বিঁধতে লাগলো। শুধু বন্দীত্বটুকু ছাড়া সে আর কিছু ভাবতেও পারছিল না। একা হলেও বা কোন ফিকির করা চলতো, কিন্তু ডেভিড আছে, আরো আছে দু'জন সঙ্গী, তাদের ফেলে রেখে তো পালানো চলে না।

দুশ্চিন্তায় খানিকক্ষণ সরোজ ছট্‌ফট্ করে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ালো, তারপর বিছানায় শুয়ে পড়লো। খাবার কথা তার মনেই রইল না।

সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে তাঁবুর ভিতরটা ক্রমশঃ অন্ধকার হয়ে উঠলো। কেউ একটা আলোও দিয়ে গেল না। শূন্য-দৃষ্টিতে সেই অন্ধকারের পানে তাকিয়ে সরোজ চুপ করে পড়ে রইল। বাহিরের অন্ধকার সরোজের মনের মধ্যেও ঘনীভূত হয়ে উঠছিল। এতটুকু মুক্তির আলো সে অন্ধকারে কোথাও সে দেখতে পাচ্ছিল না।

অনুপল, বিপল, পল ও দণ্ড এগিয়ে যাচ্ছে, প্রহরও বিলীন হয়ে যাচ্ছে কালের গর্ভে। সরোজের চোখে ঘুম নেই।

রাত তখন ঠিক কত হবে, কে জানে? সহসা রেশমী কাপড়ের একটা মৃদু খস্‌খস্‌ শব্দ ও লঘু পদক্ষেপ সরোজকে সচকিত করে তুললো—এতো রাতে এমন চুপি চুপি কে তার ঘরে এল, গুপ্ত ঘাতক নয়তো? বিছানার উপর সরোজ উঠে বসলে, জিজ্ঞেস করলে—কে? who is there?

ইংরাজীতে মেয়েলী গলায় উত্তর হোল—আমি আয়েষা, শেখের মেয়ে। আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছি—

—বলুন।

—শুনলুম, আপনারা হিন্দুস্থানের লোক?

—হ্যাঁ।

—আপনারা বাবাকে ধরিয়ে দেবার জন্য এ অঞ্চলে এসেছেন ইংরাজের গুপ্তচর হয়ে?

—না। আমাদের এক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে এক সন্ন্যাসী এই পথে ধরে নিয়ে গেছে, তাকে উদ্ধার করার জন্যই আমাদের এদিকে আসা।

—আপনি সত্যি কথা বলছেন?

—মিছে কথা বলার মত বিশেষ কোন কারণ এখনও ঘটেনি।

—তাই যদি হয়, আপনারা এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করুন। কাল বিকালে এরা ইতালিয়ানদের কাছে আপনাদের বিক্রী করবে। হাবসিদের সঙ্গে তাদের লড়াই বেধেছে। রাস্তা

তৈরী করার জন্যে আর ট্রেঞ্চ খোঁড়ার জন্যে তারা মজুর চায়।

—মজুরের কাজকে আমরা ভয় করিনে। কিন্তু ইতালিয়ানরা মানুষ কিনছে? তারা তো সভ্য জাত!

—বাইরেটা দেখে আপনারা সভ্যতা আর অসভ্যতার হিসাব করেন কেন, ভিতরটা তো সবাইকারই স্বার্থপরতায় ভরা। যাক সে কথা, ইতালিয়ানদের কাছে বিক্রী হবার আগে আপনারা এখান থেকে পালাবার ব্যবস্থা করুন।

—কিন্তু আমি তো আর একা নই, আমরা চারজন। চারজনের একসঙ্গে পালান'ও তো সহজ নয়!

—আমি যদি সে বন্দোবস্ত করে দি?

দপ্ করে সরোজের মনে সন্দেহ জেগে উঠলো। অযাচিত ভাবে এই মেয়েটা বারবার তাকে এমনি করে পালানোর কথা বলছে কেন, এতে তার কি স্বার্থ আছে? এইভাবে কি শেখ্ তার মন বুঝতে চায়? সন্দিগ্ধভাবে সরোজ জিজ্ঞেস করলে—আমি পালাই আর না পালাই তাতে আপনার লাভ?

—লাভ একটু আছে বৈকি! আমি চাইনা যে আমারই স্বজাতি অকারণে বিদেশীর হাতে নির্য্যাতিত হয়।

—আমরা আপনার স্বজাতি?

—হ্যাঁ, আমরা 'কালা আদ্‌মি', সমগ্র এসিয়া ও আফ্রিকা আমাদের স্বজাত। যাক্ সে কথা, এই নিন্ বোরখা এইটা পরে আমার সঙ্গে এখনি আসুন, ঘোড়া তৈরী—

বোরখাটী নিতে সরোজ ইতস্ততঃ করলে, বল্‌লে—কিন্তু আমার বন্ধুরা ?

—তারাও আসছে।

—আপনার বাবা ?

—কেউ এখানে নেই, সবাই কোথায় ডাকাতি করতে গেছে—

সরোজ আর দেরী করলো না, যা হবার তাতো হবেই, এমন সুযোগ, একবার দেখাই যাক না! বোরখাটা মাথা গলিয়ে পরে তাঁবুর বাইরে আসতে সরোজের দুমিনিটের বেশী সময় লাগলো না। আয়েষাকে দেখে রক্ষী কোন কথাই বললে না। বাহিরে সারি সারি তাঁবু সমতল মাঠের বুকে যেন এক-একটী ঢেউ তুলেছে। সেই তাঁবুগুলির পিছনে সারি সারি উট আর ঘোড়া বাঁধা। তারই একপাশে শাদাশাদা বোরখা পরে' আরো ক'জন দাঁড়িয়েছিল। আয়েষা চারটা ঘোড়া এনে চারজনকে ইঙ্গিতে উঠে বসতে বললে, তারপর নিজে একটা শাদা ঘোড়ার উপর উঠে বসে' ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে, বললে—follow me !

চারটা ঘোড়া তার পিছনে চললো তালে তালে।

খানিকদূর এসে কোন একসময় সরোজ আয়েষাকে জিজ্ঞেস করলে—আপনি আমাদের সঙ্গে কদ্দূর যাবেন ?

জ্বলন্ত ঘব নিব ৮৫ পৃঃ

—বরাবর—আপনারা যদ্দূর যাবেন।

—তার মানে?

—মানে, ফিরে যাবার পথতো আমি রাখিনি। শেখ্ যখন ফিরে এসে আপনাদের খোঁজ করবে, তখন রক্ষীদের মুখে আমার কথা শুনবে। ফিরে গেলে আমার অবস্থা তখন কি হবে একবার ভেবে দেখুন তো?

—কিন্তু…

—কিন্তু কি বলুন?

—আপনি বেদুইন আর আমরা বাঙালী, আপনি আমাদের সঙ্গে কোথায় যাবেন? আমরা তো হারিয়ে-যাওয়া বন্ধুর সন্ধানে বেরিয়েছি, এই আফ্রিকার কোথায় গিয়ে পড়বো কে জানে!

—যেতে আমাকে হবেই, তবে আপনাদের সঙ্গী পেয়েছি, যদি আপত্তি থাকে আমি একাই যেদিকে হয় চলে যাব—

—আপত্তির কথা বলছি না, বলছি আমাদের জীবন বাঁচিয়ে আপনার এই বিপত্তি হোল—আবাল্যের ঘর-বাড়ী আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে…

—আত্মীয়-স্বজন? আয়েষা বাধা দিয়ে বললে, এরা কেউ আমার আত্মীয় নয়। এদের চেয়ে আপনারাই আমার বেশী আত্মীয়—আমি বাঙালী।

সরোজ অবাক হয়ে গেল,—বেদুইনী-বোরখার নীচে বাঙ্গালী

মেয়ে! উৎসুক চোখে বোরখা-ঢাকা অশ্বারোহিনীর পানে তাকিয়ে রইল।

আয়েষা তখন বলে যাচ্ছে—আমার বাবা এসেছিলেন আবিসিনিয়ায় ব্যবসা করতে, তখন আমি খুব ছোট, স্বপ্নের মত মনে পড়ে। তারপর কোথাথেকে কি যে হয়ে গেল, সব ওল্টপালট হয়ে মা-বাপ হারিয়ে আমি এমন ছন্নছাড়া হয়ে এই বেদুইনদের হাতে এসে পড়েছি, আর আমি কিছুই জানি না। তবে এদের মুখেই শুনেছি, আমার বাপ-মাকে হত্যা করে এরা আমায় লুঠ করে এনেছে। তারপর থেকে ওরা আমায় শিখিয়েছে ওই শেখ্‌কে বাবা বলতে, বেদুইনদের আত্মীয় বলে ভাবতে। ওই সেখের এক ছেলের সঙ্গে তারা আমার বিয়ে দেবার সব ঠিক করে রেখেছে, কিন্তু যে লোক আমার বাপ-মাকে খুন করেছে, তার ছেলেকে আমি বিয়ে করতে পারবো না, আমি সেইজন্য পালাবার সুযোগ খুঁজছিলাম এমন সময় ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত আপনারা এসে পড়লেন,...বলে আয়েষা তার ঘোড়ার পিঠে রাশের আঘাত করলো, দুরন্ত আরবী ঘোড়া সকলকে ছাড়িয়ে ছুটলো ক্ষিপ্রবেগে—

সরোজ ও ডেভিড এতক্ষণ যেন রূপকথার কোন রাজকন্যার কাহিনী শুনছিল, সহসা আরবী ঘোড়ার পদাঘাতে উড়ন্ত ধূলোগুলো যখন চোখের সম্মুখ অন্ধকার করে ফেললো, তখন তাদের চমক ভাঙলো, তারাও ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলো।

চাঁদের আলোয় সমগ্র প্রান্তর অস্পষ্ট সুষমায় ভরে উঠেছে সীমাহীন সেই শান্ত ধূসরতার বুকে পাঁচটী ঘোড়া ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে চলেছে। পিছনে শেখের যে তাঁবুগুলি রহস্যময় পিরামিডের মত মনে হচ্ছিল, ক্রমে ক্রমে সেগুলি শাদা ছোট ছোট বিন্দুতে দৃষ্টির সামনে নিঃশেষ হয়ে গেল। দিগ্বলয়ের সীমান্তে উঁচু-নীচু প্রান্তর ছুটন্ত ঘোড়ার ক্ষিপ্র পায়ের নীচে পিছনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সাগরের ঢেউয়ের মত, কোথায় কতদূরে রহস্যময় চাঁদের আলোয় মিলিয়ে যাচ্ছে। স্তিমিত চন্দ্রালোকে সামনে ও পিছনে শুধু উঁচু-নীচু প্রান্তরের ঢেউ—যেন রহস্যময় কালের গতি, যতই অতিক্রম করে চলেছি যুগ যুগ ধরে ততই এগিয়ে আসছে—চলার বিরাম নেই, মহাকালের সীমায় পৌঁছানো যাচ্ছে না।

পাঁচটী ঘোড়া ছুটছে। ঝাঁকানির পর ঝাঁকানি লেগে আরোহীদের শরীর তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে, রক্তে ছুটছে আগুনের ফুল্‌কি, ঘোড়ার মুখে ফেনার পর ফেনা জমছে। পল, অনুপল, বিপলের সঙ্গে সমতা রেখে ঘোড়ার পাদক্ষেপ যত ক্ষিপ্র হয়ে উঠছে, দিগ্বলয়ের সীমা ততই দূরদূরান্তরে পিছিয়ে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে এই বন্ধুর প্রান্তর কতদূরে গিয়ে শেষ হবে, কে জানে!

রাত্রিশেষে প্রভাতী আলো ফুটে ওঠার কিছু পরে ধূসর

পার্ব্বত্য প্রান্তর ছাড়িয়ে তারা এসে পড়লো, শ্যামল বিটপী-ঘেরা বনপথে। গাছের পর গাছের শ্যামলিমা অনুর্ব্বর পাহাড়ের ধূসরতার বুকে সীমারেখা টেনে দিয়েছে। মাটীর রঙ বদলে গেছে। ঘোড়ার পায়ের নীচে আর ছোট ছোট বিক্ষিপ্ত পাথরের টুকরো কর্কর করে ওঠে না, গাছের পাতার মর্ম্মর শব্দ কানে মিষ্টি লাগে, ঝিরঝিরে বাতাস খানিকক্ষণের জন্য ভুলিয়ে দেয় অপরিসীম পরিশ্রমের কথা, সবুজ গাছপালার শান্ত-শ্রী খানিকক্ষণের জন্য চোখের উপর বুলিয়ে দেয় পরিতৃপ্তির প্রলেপ একটী নিঃশ্বাসে মনটা হাল্‌কা হয়ে ওঠে।

আয়েষা বলে—এসে পড়েছি। এই বনের ওপারেই রেল ষ্টেশন, আদ্দিস-আবাবা-জিবুতি রেলপথ গেছে ওদিক দিয়ে—

ডেভিড বললে—কিন্তু এই বনের মধ্যে হারিয়ে যাব না তো?

—না, এই পথ আমার জানা, শেখের দলের সঙ্গে এদিকে আমি ক'বার এসেছি।

কেউ আর কিছু বললো না, পাঁচটী ঘোড়া এগিয়ে চললো তালে তালে বনের মেঠোপথে, গাছের ছায়ার নীচ দিয়ে, কাঁটা গাছ ডিঙিয়ে, ঝরা পাতার উপর মর্ম্মর শব্দ জাগিয়ে ঘোড়া ছুটলো।

জঙ্গল ক্রমশঃ গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠলো, সূর্য্যের আলো গাছের পাতায় ঢাকা পড়ে গেল। চারিদিকে শুধু

শান্ত মৌনতা, ঘোড়ার পায়ের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। ক্ষীণ করতোয়ার মত ধূসর পথটী না থাকলে, সে বনের মাঝে এগিয়ে যাওয়া অসাধ্য হোত, হারিয়ে যেতেও বেশী দেরী হোত না।

সহসা ইঞ্জিনের শব্দ তাদের কাণে এসে লাগলো, জানিয়ে দিলে তারা বনসীমান্তে এসে পৌঁছেচে।

বনের বুক ভেদ করে ব্রাহ্মণের গলার পৈতার সূতোর মত রেলপথের লোহার পৈতা চলে গেছে। ঘোড়সওয়ার দল যখন সেই লাইনের সামনে এসে দাঁড়ালো, লৌহ-পথের এক প্রান্তে ধূমায়মান কালো ইঞ্জিনখানি তখন দেখা দিয়েছে মাত্র। ধীরে ধীরে ইঞ্জিনের পিছনের এক একখানি বগী আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো, একটা প্রকাণ্ড কলের শুঁয়ো পোকার মত সমস্ত ট্রেনখানি এগিয়ে আসতে লাগলো।

বোরখাগুলি এরা অনেক আগেই খুলে ফেলেছিল, এবার সেই বোরখা একটা হাতে নিয়ে লাইনের উপর দাঁড়িয়ে সরোজ উড়াতে লাগলো, তারপরেই চিৎকার করে উঠলো Stop ! Stop !!

ড্রাইভার দেখলো, একটা হুইশ্‌ল্ দিল মাত্র। ট্রেনের বেগ কিন্তু কিছুমাত্র কমলো না।

সরোজ আবার চীৎকার করে উঠলো—Stop—Stop—!!

ড্রাইভার আরেকটা হুইশ্‌ল্ দিল।

ট্রেনখানি তখন প্রায় সরোজের উপর এসে পড়েছে। ঘোড়াটী ভয়ে একলাফে লাইন পার হয়ে গেল, নাহলে সরোজকে চাপা পড়তে হোত। ট্রেন সমান গতিতে এগিয়ে চললো তাদের পাশ দিয়ে। সরোজ আবার চিৎকার করে উঠলো—Danger ahead ! Danger !! Danger !!!

সব শেষে গার্ডের গাড়ী তখন সরোজকে অতিক্রম করে যাচ্ছে, গার্ড সরোজের চিৎকার শুনে কি ভেবে ভ্যাকুয়াম ব্রেক্ কষ্‌লে, গাড়ী থামলো।

সরোজ ডেভিড প্রভৃতি গাড়ীর কাছে যেতেই গার্ড বন্দুক বাগিয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলে—বেদুইন ?

সরোজ তার বন্দুক ধরার কায়দা আর জিজ্ঞেস করার ভঙ্গী দেখেই বুঝেছে, সে তাদের বেদুইন ডাকাত মনে করেছে, তাড়াতাড়ি বললে—না—না, আমরা বেদুইন নই, আমরা বৃটিশ-প্রজা—

গার্ড এবার ভাঙা ভাঙা ফরাসীতে বললে—আপনারা ব্রিটিশ, ইংরিজীতে কথা বলছেন বুঝি ?—ইংরিজী আমরা বুঝিনে—আপনাদের কি হয়েছে ?

জার্ম্মান যুদ্ধের সময় সরোজ ও ডেভিড দুবছর ফরাসী সীমান্তে ছিল, চলন-সই ফরাসী ভাষা বুঝতে ও বলতে তারা শিখেছিল। সরোজের চেয়ে ডেভিডই বলতে পারতো ভাল,

সেই বললে—আমরা বিশেষ বিপন্ন, আমাদের বেতুইন ডাকাতে ধরেছিল, পালিয়ে এসেছি আমাদের আদ্দিস-আবাবায় যেতে হবে, ইংরাজ রাজদূতের সঙ্গে আমরা দেখা করতে চাই আমাদের কাছে একটীও পয়সা নেই, দয়া করে যদি আপনি আমাদের সেটুকু নিয়ে যান—

গার্ড বললে—বিপন্ন লোককে সাহায্য করতে ইথিয়ো-পিয়ানরা সব্ সময়েই তৈরী। তবে আদ্দিস-আবাবা পর্য্যন্ত আপনাদের পৌঁছে দিতে পারবো কিনা জানি না, ততদূর বোধহয় এ গাড়ী যাবে না, ইতালিয়ানরা আমাদের গাড়ী আটকাচ্ছে—

সরোজ বললে—যতদূর হয় ততদূরই ভাল, উপস্থিত তো বেতুইন ডাকাতদের হাত থেকে বাঁচি—

পাঁচজন যাত্রীকে তুলে নিয়ে গাড়ী আবার ছুটলো।

আরোহী-বিহীন ঘোড়াগুলো বনের ধারে দাড়িয়ে তাকিয়ে রইল ছুটন্ত ট্রেনখানির পানে—

•

আদ্দিস-আবাবা পর্য্যন্ত ট্রেন পৌঁছাল না।

দু'তিনটে ছোট ছোট ষ্টেশন পার হতে না হতেই মাঠের মাঝখানে ইতালিয়ান সৈনিকেরা ট্রেন ধরলো—ট্রেন থেমে গেল। সৈনিকেরা প্রত্যেক যাত্রীটিকে নাবিয়ে দিলে, প্রত্যেকের জিনিষপত্র খুলে দেখলে। মূল্যবান যা-কিছু দেখলে

পকেটে ভরলে, তারপর খালি গাড়ী ফিরিয়ে দিলে যে পথে এসেছিল সেই পথে।

সন্ধ্যার সময় মাঠের মাঝে সেই নিঃসম্বল ও নিরাশ্রয় অবস্থায় পড়ে যারা মৃদু আপত্তি তুলছিল, সৈনিকেরা তাদের পানে একবার ফিরেও তাকালো না, শুধু সেই যাত্রী-দলের মধ্যে থেকে খাটতে পারে এমন সব যোয়ান ছেলে মেয়েদের আলাদা করে ফেললে।

এক ভদ্রলোক বছর পাঁচেকের একটী ছোট ছেলেকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সৈনিকেরা তার কোল থেকে ছেলেটীকে নাবিয়ে দিয়ে তার হাত ধরে আরেক দিকে টেনে আন্‌লে। ভদ্রলোক চিৎকার করে উঠ্‌লো। সামনে সৈন্যাধ্যক্ষকে দেখে তাড়াতাড়ি তার কাছে ছুটে গেল, ভাঙা-ভাঙা ফরাসীতে বললে—হুজুর আমার উপর দয়া করুন, ছেলেটার বড় জ্বর আদ্দিস-আবাবায় যাব একটী ভাল ডাক্তার দেখাবার জন্য, আমায় ছেড়ে দিন।

সৈন্যাধ্যক্ষ হাসলেন, বললেন,—তোমাদের সব ফন্দি ফিকির আমি জানি, Blackie Nigger! তোমাদের ওসব কোন বাজে ওজর আপত্তি শুনবো না, আমাদের জন্য আদ্দিস-আবাবা পর্য্যন্ত তোমাদের রাস্তা তৈরী করতে হবে!

—ছেলেটী মরে যাবে হুজুর—বলে ভদ্রলোক সৈন্যাধ্যক্ষের পা দু'টী চেপে ধরলে। প্রতিদানে সৈন্যাধ্যক্ষ এমন কায়দায়

একটী ঠোক্কর মারলে যে ভদ্রলোক উল্টে পড়ে গেল, তথাপি ছেলেটীকে বাঁচাবার জন্য পিতা আশা ছাড়লে না, উঠে বললে—
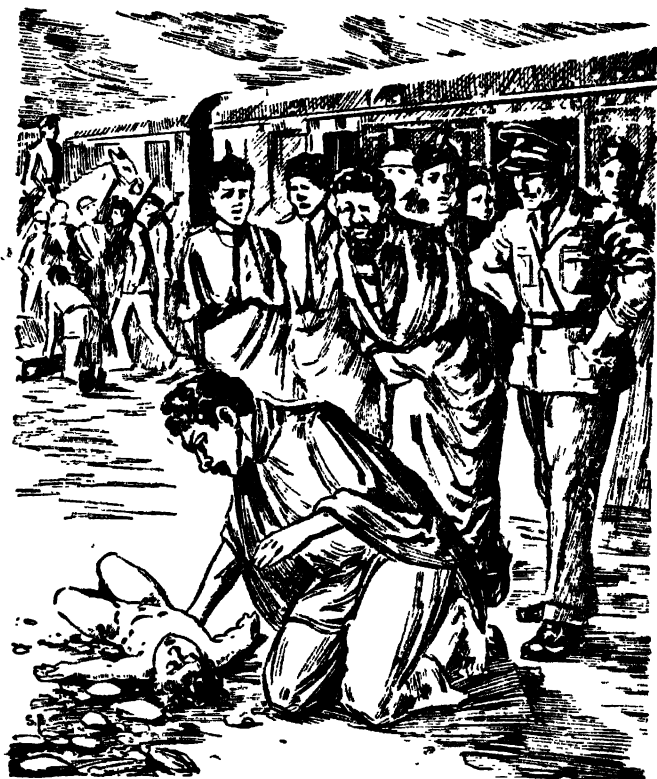
দয়া করুন হুজুর, যিশুর নামে, পরমেশ্বরের নামে, মা-মেরীর নামে আমি আপনার কাছে করুণা ভিক্ষা করছি—

সৈন্যাধ্যক্ষ সহসা ক্ষেপে গেল, রুগ্ন ছেলেটার কাছে এগিয়ে গিয়ে, দু'হাত দিয়ে ছেলেটাকে তুলে নিয়ে আছড়ে ফেলে দিলে। পাঁচ বছরের ছেলে প্রথমে ভয় পেয়ে কেঁদে উঠেছিল, মাটিতে পড়েই স্থির স্তব্ধ হয়ে গেল।

পিতা নিশ্চল স্থানুর মত কতক্ষণ হতভাগ্য পুত্রের পানে তাকিয়ে রইল, ব্যাপারটা সে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। কয়েকটা সেকেণ্ড পরেই তার সম্বিৎ ফিরে এল—প্রচণ্ড আক্রোশে তার মন মত্ত হয়ে উঠলো। যে একটু আগে সার্জ্জেণ্টের পা ধরে করুণা ভিক্ষা করেছিল, সেই এবার হুঙ্কার নিয়ে রুখে গেল সার্জ্জেণ্টের পানে।

নিরস্ত্র পদাহত মানুষ সশস্ত্র নিষ্ঠুর বিদেশী সৈনিকের সঙ্গে পারবে কেন! সৈন্যাধ্যক্ষ তখুনি কোমর থেকে পিস্তলটা খুলে নিয়ে ভদ্রলোককে গুলি করলে, তারপর হাবসীদের শুনিয়ে ফরাসী ভাষায় বললে—আমি জানি, কি করে শয়তানকে শায়েস্তা করতে হয়!

সরোজ জীবনে এমন নিষ্ঠুরতা কখনো দেখেনি, তার মুখ থেকে নিজের অজ্ঞাতেই একটা কথা বেরিয়ে এল—What a Devil he is! (কি পিশাচ!)

সৈন্যাধ্যক্ষ একমিনিটে ফিরে দাঁড়ালে, বললে—Yes, my dear English God, have you got your passport? (বলি, ইংরাজ-দেবতা, তোমাদের পাসপোর্ট আছে?)

সরোজ অপ্রতিভ হয়ে পড়লো, তাই তো তাদের কারুরই তো পাসপোর্ট নেই !

আয়েষা কিন্তু সেই সমস্যা বাঁচিয়ে দিলে, এগিয়ে এসে বললে—আমাদের পাসপোর্ট ছিল, জিনিষপত্র টাকা-পয়সা সবই ছিল, কিন্তু সোমালিল্যাণ্ডে আমরা বেদুইনদের হাতে পড়ি, তারা আমাদের সর্ব্বস্ব লুঠে নিয়েছে—প্রাণেও মারতো, কোন রকমে পালিয়ে এসেছি—

সৈন্যাধ্যক্ষ আয়েষার মুখের পানে তাকিয়ে বললে—তুমিও এদের মধ্যে একজন ! বুঝেছি, তোমরা একদল বৃটিশ স্পাই, অল্‌রাইট্‌ !!

সার্জ্জেন্ট তখুনি আদেশ করলে, ক'জন সৈনিক এসে তাদের সার্চ করলে জামার পকেট থেকে জুতোর সুকতলা পর্য্যন্ত। তারপর সার্জ্জেন্ট আদেশ করলে—নিয়ে যাও এড্‌জুটেন্‌টের কাছে, এরা বৃটিশ স্পাই।

দশজন সৈন্য তাদের মার্চ্চ করিয়ে নিয়ে চললো।

ফাঁকা প্রান্তর ও বনের সীমা যেখানে এসে মিশেছে সেই খানে গাছের আড়ালে সারি সারি ইতালিয়ান সৈন্যের তাঁবু পড়েছে। এদিকে-ওদিকে দূরে দূরে কয়েকটা অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। আশে-পাশে সৈনিকদের ভীড়। সন্ধ্যার অন্ধকারেও মাঠের মাঝে ছড়ানো কয়েকটা বড় বড় কামানের কালো

লৌহদেহের উপর অগ্নিকুণ্ডের আগুনের লালচে আভা প্রতিফলিত হচ্ছে, গোলন্দাজদের পিতলের শিরস্ত্রাণগুলো সোনার মুকুট বলে মনে হয়।

কয়েকটী তাঁবু পার হয়ে সৈন্যরা একটী অগ্নিকুণ্ডের কাছে এক তাঁবুর সামনে এসে 'হল্‌ট্‌' (Halt) করলো। সাম্‌নে একটী ক্যাম্প-চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে একজন সৈনিক চুরুট ফুঁকছিল। সেক্‌সন-মাস্টার খট্‌ খট্‌ করে এগিয়ে গিয়ে সেলাম দিয়ে জানালে—ইংরাজ গুপ্তচর ধরা পড়েছে—

ইংরাজ গুপ্তচর? অল্‌রাইট্‌—বলে এড্‌জুটেণ্ট সিদে হয়ে উঠে বসলো।

এতক্ষণ প্রত্যেক বন্দীর দু'পাশে দুজন করে সৈনিক ছিল সেক্‌সন্‌-মাস্টারের আদেশে এদিকের পাঁচজন মার্চ্চ করে সরে গেল, অপর পাঁচজন বন্দীদের এমনভাবে সাজিয়ে দিলে যেন এড্‌জুটেণ্ট প্রত্যেকের মুখ দেখতে পায়।

তীক্ষ্ণ ধারালো দৃষ্টিতে একে একে পাঁচটী বন্দীর মুখের পানে তাকিয়ে নিয়ে এড্‌জুটেণ্ট বললেন—গুড্‌ ইভিনিং ইংলিশমেন, আমাদের এদিকে কি মনে করে?

ডেভিড ফরাসী ভাষায় উত্তর দিলে—গুড্‌ ইভ্‌নিং ক্যাপ্‌টেন···

—ক্যাপ্‌টেন নয়, এড্‌জুটেণ্ট—এড্‌জুটেণ্ট ভুল শুধ্‌রে দিলেন।

ডেভিড শুধ্‌রে নিয়ে বললে—গুড্‌ ইভ্‌নিং এড্‌জুটেন্ট !

তারপর সুরু করলে আজগুবি কৈফিয়ৎ ;—সরোজ ও ডেভিড হচ্ছে হাতীর দাঁতের ব্যবসাদার, আবিসিনিয়া থেকে বিদেশে গজদন্ত চালান দেয়। সম্প্রতি জিবুতির এক জাহাজ কোম্পানীর সঙ্গে গোলযোগ বাধে, তা মিটোবার জন্য তারা জিবুতি গেছিল। ইতিমধ্যে লড়াই বাধে। এখন সংবাদ আদান-প্রদান ও গাড়ীর যাতায়াতে অসুবিধা বেড়ে গেছে, তাই তারা ঠিক করেছে ব্যবসা তুলে দেবে সেইজন্য দরকারী কাগজপত্র নিয়ে তারা আদ্দিস-আবাবায় যাচ্ছিল, পথে বেদুইন ডাকাতের দল তাদের সব কেড়ে নিয়েছে, কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে তারা পালিয়ে এসেছে। এখন যদি তাদের আদ্দিস-আবাবায় যাবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়, তাহলে সত্যি বড় উপকার হবে—

এডজুটেণ্ট বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বললে—সব বুঝেছি, তবে একটা কথা জিজ্ঞেস করি,—তোমরা তো ইংরাজ, ওই বেদুইন মেয়েটা তোমাদের সঙ্গে কেন ?

সরোজ বললে—ও আমার বোন ?

ইংরাজ মহিলার ওরকম বেদুইনের পোষাক কেন ?

ডেভিড বললে—পালাবার জন্য মেয়ের পরিচ্ছদে বেদুইনদের তাঁবু থেকে পালানো যেতো না।

এডজুটেন্ট বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বললে—জানি স্পাইদের আমি চিনি।

—কিন্তু আমরা স্পাই নই, আপনি ভুল করছেন।

—ভুল আমরা করিনি, ভুল করেছিল জার্ম্মানরা, তাই গত যুদ্ধে তারা হেরে গিয়েছিল। আমরা কিন্তু ইতালিয়ান্, ইংরাজদের আমরা ভাল করেই জানি—

ডেভিড বললে—বেশ, আপনি আমাদের ব্যবসা সম্বন্ধে আদ্দিস-আবাবা থেকে খবর নিয়ে জানুন।

—দরকার কি আছে এত হাঙ্গামায়? যুদ্ধে কতলোকই তো মরে, পাঁচজন ইংরাজ স্পাইকেও যদি আমরা গুলি করে মারি, কে তার খবর রাখবে?—বলে এড্‌জুটেন্ট সৈনিকদের আদেশ দিলে—এদের নিয়ে যাও, কাল কোর্টমার্শ্যাল্!

হাব্‌সিদের একখানি মেটে বাড়ীর একটি ছোট ঘর বন্দীশালায় রূপান্তরিত হয়েছে। কদিন আগেও হয়তো এই ঘরখানিতে এক স্নেহময়ী মা ছোট-ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে বুকের কাছে নিয়ে পরম নিশ্চিন্ত মনে রাত্রি কাটিয়েছে, ছোট ছোট ভাইবোনগুলি নির্ভয়ে খেলা করছে কিন্তু শক্তিমত্ত বিদেশী তাদের সেই শান্তিটুকু হরণ করেছে, আজ তারা কে কোথায় চলে গেছে, বিষাক্ত গ্যাস ও বোমার আশীর্ব্বাদে জগতের সঙ্গে সব সম্পর্ক তাদের ফুরিয়ে গেছে হয়তো। বিজেতার কল্যাণে পল্লীর শান্তি সৈনিকের পদক্ষেপে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে, স্নেহশীলা কুটীর হয়ে উঠেছে—যন্ত্রণাময় বন্দীশালা।

ঘরখানি অন্ধকার, গরমও যথেষ্ট, তার উপর এই আকস্মিক বিপদে সকলের মন ও দেহ শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, কথা বলতেও তাদের ইচ্ছা হচ্ছিল না। ছোট ঘরখানির মধ্যে পাঁচজন বন্দীর নিঃশ্বাস যেন রোধ হয়ে আসছিল একটা কথা শুধু তাদের মনের মধ্যে তোলপাড় হচ্ছিল,—আরবদের তাঁবু থেকে যে তারা পালালো, সে কি এই ইতালিয়ানদের কাছে কোর্ট মার্শালে জীবন দেবার জন্য ?...

কতক্ষণ বাদে হঠাৎ দরজা খুলে একজন সৈনিক চিৎকার করে উঠলো—খাবার! খাবার!! তারপরেই একটা টর্চ জেলে এক একজনের কোলের উপর এক এক টুকরো রুটি ছুড়ে দিলে, জিজ্ঞেস করলে—জল ?

সরোজ ও ডেভিড্ বলে উঠলো—ইয়েস্-ইয়েস্!!

মাটীর ভাঁড় ছিল, সেই পাঁচটী ভাঁড় পেতে লোকটী জল ঢেলে দিলে।

সারাদিন মুখটী পর্য্যন্ত ধোয়া হয়নি, আয়েষা একটু বেশী জল চাইল। সৈনিকটী একবার আয়েষার মুখের পানে তাকিয়েই রুক্ষ হয়ে উঠলো,—বললে—জল ? জল অত শস্তা নয়! এটা ইংলণ্ড নয়!!

এখানে যুক্তি ও তর্কের কোন মূল্যই নেই, বিচার ও মনুষ্যত্বের কথাই ওঠে না। হাতমুখ ধোবার জল না পেলে, না-খেয়ে যে হাত গুটিয়ে বসে থাকবো তার উপায় নেই, পেটের

মধ্যে আগুন জ্বলছে। এক এক টুকরো রুটি মুখে ফেলে আর একচুমুক করে জল খেয়ে তখনকার মত সকলে জলযোগের ব্যাপারটা সেরে নিলে।

অমন খিদের সময় আধখানা লোফ্! ডেভিড বললে—এতক্ষণ তো বেশ ছিলুম, কিন্তু এই রুটি আর জল পড়ে খিদেটা যেন আরো বেশী করে জেগে উঠলো।

সরোজ পেটে হাত বুলিয়ে একটা হাই তোলার চেষ্টা করে বললে—তবু এরা আমাদের ইংরাজ বলে ভেবেছে তাই রক্ষে, যদি 'ইণ্ডিয়ান্' বলে মনে করতো, তাহলে দয়া করে এই খাবারটুকুও দিত না।

—কেন ইংরাজ বলে ভাববে না? গায়ের রং দেখুন!—রবিদত্ত বললে।

গাইড এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল এককোণে, এবার সে বলে উঠলো—ওই ফর্সা গায়ের রং নিয়েই তো যত হাঙ্গামা—ওই দেখেই তো ইংরাজ গুপ্তচর বলে ওরা আমাদের ধরেছে, শেষে হয়তো গুলি করে মারবে গায়ের রং কালো হলে এমনটা হোত না।

গাইড্ বেচারার গায়ের রং কালো।

ডেভিড বললে—কালোদের এরা কেমন সম্মান দেয় তাতো ষ্টেশনেই দেখেছ!

সরোজ বললে—দেখ গাইড্, ওরা আমাদের ইংরাজ বলে

ভেবে যদি গুলি করে মারে সেজন্য আমার দুঃখ নেই পরাধীন দেশের বাসিন্দা বলে পরিচয় দিয়ে জুতোর ঠোক্কর খেয়ে প্রাণে বাঁচতে আমি চাই না।

আয়েষা বললে—আপনার দেশকে আপনি তো খুব শ্রদ্ধা করেন দেখ্‌ছি!

—শ্রদ্ধা মানে? আমার দেশ বলে তার সব কিছু দোষ ত্রুটি ভুলে যেতে হবে, সব যুক্তি তর্ক ফেলে দেশের নামে নেচে উঠতে হবে—এ আমি ভাল বাসি না। আগে আমার দেশকে সত্যিকারের বড় করে আদর্শ করে তুলতে হবে, তখন দেশের নামে আমি মাথা লুটিয়ে দেব। তার আগে আমার দেশ বড়, আমার দেশ ভাল, বলে লোক-দেখানো শ্রদ্ধা জানাতে আমি পারবো না।

ডেভিড বললে—কেন, আপনাদের কি সত্যি গৌরব করার মত কিছু নেই? তাজমহল্, কুতব্-মিনার, দেওয়ানী খাসের মত স্থাপত্য, মাদুরা, রামেশ্বর, ভুবনেশ্বরের মত মন্দির, অজন্তা, ইলোরা, এলিফ্যান্টার গুহা, অশোক, হর্ষবর্দ্ধন ও শিবাজীর মত রাজা, বুদ্ধ, চৈতন্য, বিবেকানন্দের মত মানুষ······

রবিদত্ত হেসে বললে—আরো আছে মিষ্টার ডেভিড আরো আছে—রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, অরবিন্দ, দেশবন্ধু···

সরোজ বললে—এঁদের আমি জানি, এঁদের মহত্ত্ব আমি স্বীকারও করি। কিন্তু এঁদের আড়ালে কারা আছে জান?

বুদ্ধদেব

—অনাহারী অশিক্ষিত অসংখ্য গেঁয়ো লোক, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, বেরিবেরি, আর থাইসিস্ যাদের ঘরে ঘরে বাসা বেঁধেছে। যখন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর কথা ভাববো, তখন তাদের কথা ভুললেও তো চলবে না, রবীন্দ্রনাথ একজন আর এরা যে অসংখ্য…

—বড় গোলমাল হচ্ছে, সাই—লেন্ট !

—সহসা রক্ষী গর্জ্জন করে উঠলো।

গাইড্ বললে—দুটো কথা বললেও দোষ ?

হুম্ করে প্রহরী গর্জ্জন করে উঠলো, বললে—বেশী বক্‌বক্ করলে সঙীনের খোঁচা দিয়ে তোমার মুখ আমি বন্ধ করবো, জেনে রেখো!

গাইড্ বেচারার মুখ চূণ হয়ে গেল।

সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল।

শ্রীচৈতন্য

সময় কাটে। টিক্ টিক্ করে অবিরাম বিদায় জানিয়ে

বিবেকানন্দ

অন্ধকারের ছায়ার বুকে সময় লুপ্ত হতে থাকে, প্রতি সেকেণ্ডে মানুষকে বুঝিয়ে দেয় এই পৃথিবীর দিন ক্রমেই সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে, এমন সুন্দর জগৎ ছেড়ে যাবার জন্যে মৃত্যুর ট্রেন ক্রমেই কাছে আসছে, জগতের শ্রী ও সুন্দরের মায়া-দড়ি ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

ঘড়ির সময় সবসময় মানুষের মনকে স্পর্শ করে না। শান্তি ও অশান্তির মাত্রা বুঝে মানুষের মনের কাছে মুহূর্ত্তগুলি ক্ষণস্থায়ী ও দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ওঠে। উৎসবের আনন্দে যে নিমেষগুলি উপলব্ধির মধুরতায় সকালবেলার শিশিরের মত ঝলমল্ করে উঠে কোথায় মিলিয়ে যায়, বিষাদের অবসরে সেই লহমাগুলিই জমাট বেঁধে ওঠে শীতের কুয়াসার মত

দেশবন্ধু

ঘড়ি না থাকলেও মানুষ তখন শুনতে পায় প্রতি মুহূর্ত্তের পদধ্বনি। সরোজরাও শুনতে পাচ্ছিল রাত্রির পদধ্বনি। ঘড়ি না থাকলেও প্রতিটী মুহূর্ত্ত চলে যাচ্ছে তারা বুঝতে পারছিল। চোখে তাদের ঘুম নেই। দুর্ভাবনা তাদের মনের চারিদিকে ঘিরে ফেলেছে ঘরের দেওয়ালের মত। এই অশান্তির দেয়াল না ভাঙতে পারলে আরামের নিঃশ্বাস ফেলার উপায় নেই। রাত্রির অন্ধকার চারিপাশ থেকে যেন চেপে ধরছে।

অনুপল-বিপল গুণে রাত তো কাটলো—ঊষার আলো আকাশকে প্রদীপ্ত করে তুললে, কিন্তু মনের দুর্ভাবনার অন্ধকারে আলোর শিখা তো দেখা দিল না।

কতক্ষণ পরে সান্ত্রী এসে জানালো—যেতে হবে—

পাঁচজন দুর্য্যোগের প্রতীক্ষা করছিল উঠে দাঁড়ালো, ঘরের বাহিরে এল। দশজন সৈন্য বাহিরে দাঁড়িয়ে ছিল, দু দলে ভাগ হয়ে গেল। মাঝে গিয়ে দাঁড়ালো বন্দী পাঁচজন সবাই মার্চ্চ করে চললো।

সরোজ, তার দুহাত ধরে দুজন সৈনিক।

ডেভিড, তারও দুপাশে সৈনিক।

রবিদত্তর দুদিকে দু'জন।

দু'জনের মাঝে আয়েষা।

সবার শেষে দুজনে নিয়ে চলেছে গাইডকে।

...তাঁবুগুলির পিছনে যেতেই চোখে পড়লো প্রশস্ত মাঠ, দূরে দূরে কজন সৈন্য টহল দিচ্ছে। একদিকে এক তাঁবুর পাশে কখানি ক্যাম্প-চেয়ার পাতা, তার উপর কালকের এড্‌জুটেন্ট ও তার দুজন সঙ্গী বসে। এড্‌জুটেন্ট সঙ্গী দুজনের সঙ্গে কি কথা বলছিলেন,

মহাত্মাজী

এমন সময় বন্দীদের হাজির করা হোল। যে সার্জ্জেণ্ট সরোজদের ধরেছিল, সে সঙ্গেই ছিল, এড্‌জুটেন্ট তাকে কি কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করলেন, তারপর সরোজদের লক্ষ্য করে ইংরাজীতে বললেন—ইংরাজ বান্ধবী ও বন্ধুগণ, তোমাদের সম্বন্ধে সার্জ্জেণ্টের মুখ থেকে আমি যা শুনলুম, তাতে তোমরা যে ইংরাজ গুপ্তচর সে সম্বন্ধে আমার আর কোন সন্দেহই নেই। আবিসিনিয়ার রাজা হেল্‌সেলাসী তোমাদের এই কাজে লাগিয়েছেন। তোমরা ভেবেছ ধরা পড়লেও ইংরাজ বলে তোমরা আমাদের হাত থেকে রক্ষা পাবে। কিন্তু আমরা তেমন নির্ব্বোধ নই! তাছাড়া যুদ্ধের আইন

জাতি বর্ণ বিচার করে না, তা নিশ্চয়ই তোমাদের অজ্ঞাত নয়।

সরোজ বললে—যুক্তি ও তর্ক দিয়ে আপনাদের বোঝানো যাবে না তা আমরা জানি, তথাপি আমরা বারবার বলছি আমরা ব্যবসাদার। সোমালিল্যাণ্ডের আরবেরা আমাদের সর্ব্বস্ব লুঠ করেছে, আমরা বহু কষ্টে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি। এখন কোথায় আপনারা আমাদের সাহায্য করবেন তা নয়, উপরন্তু আপনারাই আমাদের গুপ্তচর বলে অভিযুক্ত করছেন! য়ুরোপের সভ্যতা-গৌরবী ইতালি জাতির কাছ থেকে আমরা এই ব্যবহার প্রত্যাশা করিনি।

—সভ্যতা-অসভ্যতার কথাই এখানে ওঠে না,—এড্‌জুটেণ্ট বললেন,—যুধ্যমান জাতি কোন নীতি মেনে চলে না। তবু আমরা সুসভ্য বলেই তোমাদের বিচার করছি, নাহলে এশিয়াটিক্ কোন জাতি হলে কাল সেইখানেই তোমাদের গুলি করে মারা হোত!

ডেভিড্ বললে—গুলি আমাদের করাই হবে—কোর্ট মার্শাল্ মানে শুধু একটা বিচারের অভিনয় মাত্র!

এড্‌জুটেণ্ট কোন কথাই বললেন না, ভ্রূ দুটী কুঁচকে একবার সরোজের মুখের পানে তাকালেন মাত্র, তারপর মৃদু হেসে সঙ্গী দুজনের পানে মুখ ফেরালেন। খানিকক্ষণ আস্তে আস্তে কি কথাবার্ত্তা হোল—পরামর্শই বোধ হয়। তারপর সহসা

এড্‌জুটেণ্ট উঠে দাঁড়ালেন, বলতে সুরু করলেন্—ইংরাজ বন্দীগণ, তোমরা যে গুপ্তচর, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ আমরা পেয়েছি তোমরা অস্বীকার করলেও সে-সব যুক্তি ও প্রমাণ উপেক্ষা করা যায় না। যুদ্ধের সময় গুপ্তচরের শাস্তি প্রাণদণ্ড। তোমাদের অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে আমিও তোমাদের সেই দণ্ডই দিলুম। কাল সূর্য্যোদয়ের সময় তোমাদের পাঁচজনকে গুলি করে হত্যা করা হবে। ভগবান তোমাদের আত্মার কল্যাণ করুন!

বলা শেষ হলে এডজুটেণ্ট বসলেন, তারপর সার্জ্জেন্টকে ইঙ্গিৎ করলেন। সার্জ্জেন্ট সান্ত্রীদের আদেশ করলে। সান্ত্রীরা বন্দীদের নিয়ে যাবার জন্য আগের মত এক একজন বন্দীর দুপাশে দুজন করে এসে দাঁড়ালো। এমন সময় সরোজ চিৎকার করে উঠলো—স্যার, আমার একটা প্রার্থনা আছে আপনার কাছে—

—কি?

—আমায় শ'খানেক চুরুট আর গোটাদুয়েক দেশলাই দেবার আদেশ করুন। কাল সকালেই যখন মরবো, আজ সারা রাত চুরুট খেয়ে মরতে চাই!

এড্‌জুটেন্ট হাসলেন, নিজের হাতের জ্বলন্ত চুরুটটার পানে তাকিয়ে বললেন—অল্‌রাইট্, আমি তোমার জন্য এখুনি অর্ডার করছি—

সান্ত্রীরা বন্দী পাঁচজনকে মার্চ্চ করে ফিরিয়ে আনলো—সেই ছোট্ট ঘরটাতে।

পাঁচজন বন্দীর মুখে মৃত্যুর ছায়া পড়েছে। কাল এতক্ষণে তারা সট্ ডেড্ (shot dead)! তারপর কি হবে কেউ জানে না। মৃত্যুর অন্ধকার কোথায় তাদের টেনে নিয়ে যাবে—নতুন আলোর জগতে কি অন্ধকারের কারাগারে, কিছুই জানা নেই। তবু তাদের সেই অজানা জগতে যেতেই হবে। গায়ের জোর! যাদের ক্ষমতা আছে তারা সভ্যতার নামে বর্ব্বরতা প্রচার করবে, বোমা মেরে অন্যায়কে ন্যায় বলে প্রমাণ করবে, যেখানে প্রতিবাদের ধূঁয়া উঠবে সেখানে বিরোধ বলে সন্দেহ হবে, সেখানেই নররক্তে ধরিত্রীকে করে তুলবে কলুষিত। আদিম যুগে মানুষের মনের মধ্যে যে পশু ছিল তা এখনও ভাল ভাবেই বেঁচে আছে।

কথা বলতে কারুর আর ভাল লাগছে না। জীবনের সব কিছু সৌন্দর্য্য যেন সহসা ফাঁকা হয়ে গেছে। ক্ষুধা নেই তৃষ্ণা নেই, যেন সব হাওয়ার উপর ভেসে বেড়াচ্ছে, হাওয়াটাই যেন এখন তাদের কাছে সব চেয়ে বেশী আপন, বাকী জগৎটা অর্থহীন! ভাব্‌বার ক্ষমতাও বুঝি আর নেই। সামনে জানালাটার পানে তাকিয়ে বসে আছে। মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করছে। সময় কাটছে কি না, এখন যেন আর কেউ কিছু বুঝতে পারছে না।

কতক্ষণ পরে রক্ষী এসে রুটি-চা, ও সরোজের চুরুট-দেশলাই দিয়ে গেল। খেতে আর তেমন কারুরই আগ্রহ নেই। শেষে ডেভিড সহসা বলে উঠলো—সব চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে রইলে যে, খেয়ে নাও—খেয়ে নাও! কাল মরবো, তো আজ কি? বলে নিজে খেতে সুরু করে দিলে!

তাকে খেতে দেখে সহসা সবাই যেন খিদেটা টের পেলে, নিজ নিজ চা ও রুটির দিকে হাত বাড়ালে।

খেতে খেতে সরোজ বললে—তোমরা যেরকম মুষড়ে পড়েছ, তোমরা হয়তো এখুনি পাগল হয়ে যাবে। রুষিয়ার বিখ্যাত লেখক ডস্টইভস্কির কোর্ট মার্শাল্ হয়। যখন তাকে গুলি করে মারা হবে, ঠিক সেই সময় রাজার লোক এসে জানালে তাকে প্রাণভিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ডস্টইভস্কি প্রথমে সেই কথাটা যেন বিশ্বাস করতেই পারেন নি। তারপর ডস্টইভস্কি অনেকদিন বেঁচেছিলেন বটে, কিন্তু 'এখুনি মরতে হবে' —এই যে ভীতি, এর শক্ তিনি সমস্ত জীবনেও কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। আ-মরণ তার মাথার মধ্যে একটু গোলমাল ছিল।

ডেভিড বললে—শুধু ডস্টইভস্কি কেন, ইংলণ্ডের রাজা চার্লসের যখন ফাঁসি হয়, এক রাত্রে তাঁর মাথার সমস্ত চুল পেকে শাদা হয়ে গেছিল। আমরা যেভাবে বসে আছি, আমার মনে হয় কাল সকালে হয়তো আমাদেরও দু-একজনের মাথা শাদা হয়ে যাবে।

সরোজ বললে—শাদা হতে দেব কেন? তার আগেই আমরা ভাগ্‌বো—

সকলে খেতে খেতে উৎসুক চোখে সরোজের মুখের পানে তাকালো। এখনও তাহলে বাঁচার সম্ভাবনা আছে!

দিনের আলো নিভে গেছে। অন্ধকারের বুকে অন্ধকার জমা হয়ে পাথরের মত ঘন হয়ে দুর্ভেদ্য গুমোট হয়ে উঠেছে। এই রাত্রির অন্ধকার শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই জীবনও শেষ হয়ে যাবে—সকলেরই মনে দুর্ভাবনা।

সরোজ একবার পলানোর ইঙ্গিত জানিয়ে সেই যে চুপ করেছে আর কথাটী বলেনি। মুখে একটীর পর একটী চুরুট ফুরিয়ে খাচ্ছে, এক এক টানে জ্বলন্ত চুরুট ধ্বক্ ধ্বক্ করে উঠছে, সরোজের মুখ দেখা যাচ্ছে, জামার বোতামগুলি ঝল্‌মল্ করে উঠছে, বোঝা যাচ্ছে সরোজ ঘরের মধ্যে পদচারণা করছে।

এক একবার সরোজ জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাহিরের পানে তাকিয়ে দেখছে: একজন সৈনিক ওপাশে টহল্ দিচ্ছে। কোথায় আগুন জ্বল্‌ছে, দেখা যায় না, কিন্তু তার রক্ত আভা সৈনিকের হেল্‌মেটে, য়ুনিফর্মের বোতামে ও রাইফেলের বেয়োনেটে প্রতিফলিত হয়ে ঝল্‌মল্ করছে।

জানালার সামনে থেকে সরোজ সরে এল। ঘরের মধ্যে

আবার খানিকক্ষণ পায়চারি করলে। কয়েকটা চুরুট জ্বালালে ও শেষ করলে। তারপর দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। একবার বাইরে উঁকি মেরে দেখলে। দরজাটা যেটুকু ফাঁক করা যায় তার মধ্যে দিয়ে দেখা গেলঃ আগুন জ্বলছে। আগুনের কাছে ক'জন গোলন্দাজ সৈনিক এরোপ্লেন-মারা একটা কামানের মুখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঠিক করছে, পাশেই একটা অনুসন্ধানী-আলো প্রচণ্ড দীপ্তি ছড়িয়ে দিচ্ছে আকাশের পানে। কামানের গা, আগুনের অভায় এমন লাল দেখাচ্ছে যেন এখুনি আগুনের মধ্যে থেকে বাহির করা হোল।...

এদিকে দ্বাররক্ষী শাস্ত্রী দরজার সামনে এসে পড়েছে দেখে সরোজ তাড়াতাড়ি সরে এল।

আবার সুরু হোল ঘরের মধ্যে পদচারণা করা।

সহসা সরোজ ডাকলে—ডেভিড!

ডেভিড উঠে গেল সরোজের কাছে। খানিকক্ষণ চুপি-চুপি সরোজ তাকে কি বললে। একবার দরজার পাশে নিয়ে গিয়ে ফাঁক দিয়ে তাকে কি দেখালে। তারপর এগিয়ে এসে চাপা গলায় সরোজ সকলকে জিজ্ঞেস করলে—তোমরা সবাই জেগে আছ?

আয়েষা জবাব দিলে—আজ রাত্তিরে কি আর ঘুম হয়!

সরোজ বললে—তোমরা সবাই এমনি শান্তভাবে কাল

সকালে গুলি খেয়ে মরতে রাজী আছ,—না বাঁচার জন্য একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাও?

ডেভিড বললে—কিন্তু তাতে বিপদ আছে, ধরা পড়লে এখুনি ওরা আমাদের গুলি করে মারবে—.

আর্টিষ্ট বললে—মরতেই যখন হবে, তখন একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?

—এই ভাবেই আপনারা এখন দশমাইল পথ ছুটতে পারবেন?

আর্টিস্ট বললে—কেন পারবো না?—প্রাণে বাঁচলে পায়ে সর্ষের তেল মালিশ করার অনেক সময় পাওয়া যাবে।

:

—বেশ! বলে সরোজ সহসা সেইখানেই শুয়ে পড়লো। ডেভিড হৈ চৈ করে উঠ্‌লো। গোলমাল শুনে সান্ত্রী দরজার ফাঁকে ভিতরে টর্চ্চের আলো ফেললে। ডেভিড ইংরাজীতে চিৎকার করে বললে—জল আনো জল, না হলে লোকটা হয়তো এখুনি মারা যাবে।

সোমালী সৈন্য ইংরাজী ভাল বোঝে না, শুধু বললে—No no—

ডেভিড ব্যস্তভাবে গাইডকে ডাকলে, বললে—রক্ষীকে বুঝিয়ে বল তাড়াতাড়ি একটু জল আনতে—বেশী চুরুট খেয়ে সরোজ বাবু অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

গাইড আম্‌হারিক ভাষায় রক্ষীকে কি বোঝালে, রক্ষী গেল জল আনতে।

একটু পরে মাটির পাত্রে একপাত্র জল নিয়ে সৈনিকটী ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালো। জলপাত্রটী নাবিয়ে রেখে সরোজের

অবস্থা দেখার জন্য যেই সে নীচু হয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ডেভিড তার উপর লাফিয়ে পড়লো, তাকে মাটীতে ফেলে তার মুখ চেপে ধরলো। সরোজও ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে আয়েষার কাছ থেকে ওড়নাখানা চেয়ে নিয়ে ডেভিডের সাহায্যে

সৈনিকের হাত-পা বেঁধে ফেললে। পকেটে ছিল রুমাল, তাই সৈনিকের মুখের মধ্যে ভরে দিয়ে আরেকখানি রুমালে তার মুখ বেঁধে দিলে, যেন সে চিৎকার করতে না পারে। তারপর সৈনিকের য়ুনিফর্মটা সরোজ খুলে নিলে, আয়েষাকে বললে—ও মেয়েলি পোষাকে অনেক অসুবিধা হবে, আপনি এই পোষাকটা পরে নিন—

তারপর সৈনিকের কার্তুজ বেল্‌ট্‌টা খুলে সরোজ নিজে পরলে, রাইফেলটা নিলে হাতে। রাইফেলের মুখ থেকে কিরিচটা খুলে দিলে ডেভিডের হাতে। দরজা থেকে মুখ বাহির করে চারিপাশটা ভাল করে একবার দেখে নিলে, তারপর ভিতরে এসে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলে—সব রেডি ?

জবাব হোল—ইয়েস্ !

—অলরাইট বেরিয়ে এসো—

পর পর পাঁচজন সেই ঘর থেকে বাহির হয়ে এল।

প্রথম ডেভিড।

ডেভিডের পিছনে আয়েষা।

তারপর গাইড্।

আর্টিষ্ট রবিদত্ত।

সবার শেষে সরোজ.

সন্তর্পণে ঘর থেকে বেরিয়ে, যেদিকটা আর সব দিকের

চেয়ে অন্ধকার, সেই দিকটাই সরোজ বেছে নিলে। সকলের পিছন থেকে সরোজ চাপা গলায় আদেশ দিলে—লেফ্‌ট হুইল্! ডবল্ মার্চ্চ (বাঁয়ে ফের,—ব্রজেৎ)!

যে-কজন গোলন্দাজ এরোপ্লেন-মারা কামান ঠিক করছিল তাঁরা একবার এদিকপানে তাকালো, পলায়মান বন্দীদের দেখতে পেল কি না ঠিক বোঝা গেল না, তারা আবার নিজের কাজে যোগ দিলে।

উপরে এরোপ্লেন থেকে যেন দেখা না যায়, এজন্য যতটা সম্ভব অন্ধকার করে রাখা হয়েছে, তাতে রক্ষীদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে সরোজদের পালানোর আরো সুবিধা হয়ে গেল। সরোজরা যতটা নিঃশব্দে পারে ছুটে চললো, পিছনে গোলন্দাজদের অগ্নিশিখা ক্রমেই ম্লান হয়ে আসতে লাগলো।

প্রথমে যেটা চোখে পড়েনি সেটা চোখে পড়লো, অতর্কিতে খানিকটা এগিয়ে এসে—ঢালু হয়ে পার্ব্বত্য ভূমি সেখানে নীচের দিকে নেবে গেছে তারই একটু নীচে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া। বেড়ার পাশে পাশে খানিক দূরে দূরে আগুন জ্বলছে, আগুনের কাছে এক একজন সৈনিক পায়চারি করছে। উপত্যকার মাথায় পাঁচজন পলাতকের ছায়া পড়তেই সোমালী গার্ড স্থির হয়ে দাঁড়ালো। ডেভিড তা দেখেই থমকে দাঁড়ালো, সরোজের মাথার মধ্যেও কেমন গোলমাল হয়ে গেল।

আয়েষা মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করলে—What is to do next Sir !

সরোজ এক মিনিট কি ভেবে নিলে তারপর কার্ত্তুজ বেল্‌টটা খুলে আয়েষাকে পরিয়ে দিয়ে তার হাতে বন্দুকটা দিয়ে বললে—আপনি এখন একজন ইতালিয়ান ক্যাপ্‌টেন, বুঝলেন ?

আয়েষা মাথা নাড়লো।

সরোজ বললে—মনে রাখবেন, আপনার উপর এখন আমাদের জীবন মরণ নির্ভর করছে।

আয়েষা বললে—বুঝেছি।

সরোজ বললে—আপনি সবার আগে এগিয়ে চলুন। গার্ড আপনাকে জিজ্ঞেস করলে বলবেন—আমরা তিনজন ইতালিযান স্পাই, ও একজন গাইড্‌। আপনি আমাদের খানিকটা এগিয়ে দিতে যাচ্ছেন।···তারপর যা করতে হয় আমরাই করবো—বুঝলেন তো ?

আয়েষা বললে—বেশ।

বন্দুক কাঁধে ফেলে গট্‌গট্‌ করে আয়েষা এগিয়ে চললো, পিছনে চললো চারজন সঙ্গী।

গার্ড দিচ্ছিল একজন সাধারণ সোমালী সৈন্য। সৈনিকের য়ুনিফর্মে সুন্দরী আয়েষাকে দেখে ইতালিয়ান 'মেজর' মনে করে সৈনিকের কায়দায় স্যালুট্‌ করলো। আয়েষা সোমালী ভাষায় জিজ্ঞেস করলে—তোমার নম্বার ?

ওই সেই দুরাত্মা, ওকে গুলি কর সরোজ !

—২০৯ পৃষ্ঠা

—সাত, সেকসন্ বি।

—অলরাইট্ নম্বার সেবন্, এডজুট্যাণ্টের হুকুম—এদের ছেড়ে দাও, এরা গুপ্তচর।

—বেশ। কিন্তু এদিকে তো সামনেই বন, ওদিকে ভাল পথ ছিল—

আয়েষা স্বরে একটু কঠোরতা মিশিয়ে বললে—অফিসারের হুকুম!

সৈনিকটী তাড়াতাড়ি আরেকটী কুর্ণিশ করে বললে, যে আজ্ঞা!

আয়েষা তাকে পাশ কাটিয়ে সঙ্গী চারজনকে নিয়ে ক' পা এগিয়েছে, এমন সময় সোমালী গার্ড ব্যগ্র ভাবে এগিয়ে এসে বললে—আদেশপত্রটী আমায় দিতে আজ্ঞা হয়!

—এই যে দিচ্ছি, বলেই সহসা চোখের নিমেষে আয়েষার হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে সরোজ তার কুঁদো দিয়ে প্রচণ্ড এক আঘাত করলো সোমালী সৈনিকের মাথায়। বেচারার মাথার মধ্যে বিদ্যুতের ঝল্‌কানি লাগলো যেন, বজ্রাহতের মত অচৈতন্য হয়ে সে ঘুরে পড়লো মাটীর উপর।

আয়েষা জিজ্ঞেস করলো—মেরে ফেললেন নাকি?

—না, এতো সহজে এরা মরে না, শুধু ঘন্টা দুয়েকের জন্যে মুখ বন্ধ করা গেল মাত্র—বলে সরোজ সোমালী গার্ডের বন্দুক ও কার্তুজ বেল্‌ট্‌টা খুলে নিয়ে ডেভিডের হাতে দিলে, বললে—এখুনি পরে নাও, কখন দরকার হবে জানা নেই!

তারপর যতটা সম্ভব সন্তর্পণে কাঁটা তার ডিঙিয়ে তারা সামনের বনানী-সঙ্কুল অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বন্ধুর উপল-বহুল পার্ব্বত্যভূমির উপর দিয়ে এগিয়ে যাওয়া যেমন কষ্টসাধ্য, শত্রুর চোখে ধূলো দিয়ে লুকিয়ে পালানো তেমনই সহজ। পালাবার সময় পাহাড়ের গায় প্রতি পাথরের নুড়িটী, ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত প্রয়োজনীয়, শত্রুর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কখন কোন পাথরের আড়ালে মাথা বাঁচিয়ে চলতে হবে তার কোন ঠিকানা নেই, তেমনি তাড়াতাড়ি চলতে হলে এর চেয়ে বড় শত্রুও আর নেই, প্রতি মুহূর্ত্তে পা পিছ্‌লে যাবার মচ্‌কে যাবার সম্ভাবনা—চড়াই আর উৎরাই ভাঙ্‌তে ভাঙ্‌তে পা সাম্‌লে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাওয়া চলে না। খানিকক্ষণ চললেই হাঁটু কন্ কন্ করে ওঠে, মনে হয় পা দুটা যেন আর দেহটাকে ঋজু করে বইতে পারছে না।

অন্ধকারে দলটী সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছে। এ দিকে আত্ম-রক্ষার আগ্রহ আরেকদিকে মৃত্যুর আতঙ্ক। তারপর দিক যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে ঘুরে-ফিরে আবার হয়তো কোন ইতালিয়ান সেনাদলের ক্যাম্পে গিয়ে পড়বে—তখন আর প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরে যাবার কোন পথই থাকবে না। তথাপি না চলে উপায় নেই, উঁচু-নীচু প্রস্তর-বহুল পাহাড়ের উপর দিয়ে পা দুখানি এগিয়ে চলেছে অবিরাম। অন্ধকারে বাধার অন্ত

নেই, গাছের ডালে বাধা, পাথরের পর পাথরে বাধা, কখন আবার ঘন-সন্নিবিষ্ট গাছ পথকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে, চলতে চলতে দেহ অবসন্ন হয়ে ওঠে, একঘন্টা পরিশ্রমের পর মনে হয় যেন একটা দিনের খাটুনি গেছে।

প্রথমে তারা সুরু করেছিল ডবল্ মার্চ্চ, তারপর ছুটতে ছুটতে কখন যে তারা ধীর থেকে ধীরতর, ধীরতম হয়ে সাধারণ ভাবে হাঁটতে সুরু করেছে, তা তারা নিজেরাই জানে না। আর জেনে বিশেষ কিছু লাভও নেই, কেন না আর ডবল মার্চ্চের শক্তিও কারুর নেই।

সহসা পতনের শব্দে সবাই চমকিত হয়ে উঠলো। চলতে চলতে আয়েষা পা পিছলে পড়ে গেছে।

সরোজ পিছনেই ছিল, তাড়াতাড়ি সাহায্য করলে, আয়েষা উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু এক পা এগুতে গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়লো,—পা আর ফেলতে পারছে না।

সরোজ জিজ্ঞেস করলে—খুব লেগেছে ?

আয়েষা বললে—না, বিশেষ কিছু নয়, তবে পা'টা এমন মচকে গেছে যে আর চলতে পারছি না।

আয়েষা বসে পড়লো।

সরোজের মুখ কালো হয়ে উঠলো—আপনি কি মোটেই চলতে পারবেন না ?

আয়েষা তখন ব্যথিত পা'খানিকে দুহাতে মালিশ করে সুস্থ হবার চেষ্টা করছিল, মাথা নেড়ে বললে—না।

ডেভিড বললে—তবেই তো মুস্কিল!

রবিদত্ত বললে—এজন্যই আমাদের শাস্ত্রে আছে "পথি নারী বিবর্জ্জিতা"।

—কিন্তু যে নারী আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছে, তাকে তো আর পথে বর্জ্জন করা চলে না।

—তাহলে আজ রাত্তিরে আমরা এখানেই থেকে যাই—রবিদত্ত বললে।

ডেভিড বললে—অসম্ভব। আমরা ঘণ্টা দুয়েক মাত্র চলেছি, খুব বেশী হলে ছ' মাইলের বেশী আসি নি। আজ রাত্তিরে এখানে থাকলে, কাল সারাদিনও এখানে থাকতে হবে। দিনের বেলা পালাবার অসুবিধা আছে অনেক, তাছাড়া ইতালিয়ান প্লেন যদি আমাদের একবার দেখতে পায়......

গাইড বললে—কিছুই হবে না, ভগবানের নাম করে এখানেই রাত কাটিয়ে দিন—

সরোজ বললে—দুর্ব্বল লোক ভগবানে বিশ্বাস করে, না হলে ভগবান বলে কিছু নেই। ভগবান মানেই বুজরুকি, এই ভগবান দেখিয়ে বড়লোকেরা গরীবদের ঠকিয়ে খায়।

আয়েষা এবার কথা বললে, বললে—আমার জন্যই আপনাদের যখন এতো দুশ্চিন্তা, তখন আপনারা যান, আমি

এখানেই থাকি, সম্ভব হলে কাল আপনাদের ধরবো, না হ'লে আমার ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নিতে পারবো—

—আপনাকে এই অবস্থায় এখানে ফেলে রেখে আমরা চলে যেতে পারি না, আপনার জন্যেই আমরা বেদুইনদের হাত থেকে বেঁচেছি, সে কথা কি আমরা এরই মধ্যে ভুলে গেছি ভাবেন? আপনি যদি চলতে না পারেন, তার জন্য কি, আমি আপনাকে কাঁধে তুলে নিচ্ছি,—বলে সরোজ আয়েষাকে কাঁধের উপর তুলে নিলে। আয়েষা বোধ হয় আপত্তি জানাতো। কিন্তু সে সুযোগ পেলে না। সঙ্গীদের সরোজ বললে—কমরেড্স, মার্চ্চ অন্!

আবার সুরু হোল অজানা পথে চলা—

পলাতকের পথ চলা—

রাত্রির অন্ধকারে আগাছায় মাঝে মাঝে পা বেধে যাচ্ছে, তবু থামলে চলবে না, ক্লান্তিতে দেহ অবসন্ন, তথাপি বিশ্রাম করা চলবে না, কতবার ছোট ছোট গাছের ডালপালায় লেগে জামাকাপড় ছিঁড়ে গেছে, কিন্তু বেশভূষার প্রতি লক্ষ্য রাখার সময় এখন নয়, কিছু ভাবার মত মন নেই, বিচার করার মত অবসর নেই—এখন শুধু পথ চলা, বন্ধুর উঁচুনীচু আগাছা ও গুল্মময় পাহাড়ী পথ আর পথ।

দেখতে দেখতে ভোরের আলোয় নীল অন্ধকার আকাশ ফ্যাকাশে হয়ে এল, পলাতকরা তখন পাহাড়ী পথ পার হয়ে

সমতল জমিতে নেবে এসেছে। চারি পাশে নানা গাছের জঙ্গল। জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করে ডেভিড বললে—এবার আমরা এখানে বিশ্রাম করি—

সরোজ কাঁধ থেকে আয়েষাকে নাবিয়ে দিয়ে বললে—জঙ্গলে যখন এসে পড়েছি, এখন আমাদের পায় কে? ইতালিয়ানরা এখানে আমাদের খুঁজে বার করতে পারবে না।

রবিদত্ত ঝুপ করে বসে পড়লো, বললে—তেষ্টা যা পেয়েছে, উঃ!

সরোজ বললে—তেষ্টা যে কার কম পেয়েছে তাতো বুঝিনে, সবাই আগে খানিক জিরিয়ে নি, তারপর জলের খোঁজ করা যাবে—

সুবিধামত একটু জায়গা দেখে সবাই বসে পড়লো।

সোনালী সূর্য্যের আলো ক্রমশঃ দীপ্তিমান হয়ে উঠছে গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে। এক এক টুকরো রশ্মি এসে পড়েছে বনভূমির উপর, পাতাগুলি রোদ লেগে ঝিক্‌মিক্ করে উঠছে। ঝিরঝির করে বাতাস বইছে। মৃদু বাতাসের স্পর্শ লেগে মাথার অনেক উপরে গাছের পাতাগুলি শির শির করে কেঁপে উঠছে, মর্ম্মর শব্দ ভেসে আসছে কানে। বাতাসের পেলব পরশ সইতে না পেরে বৃদ্ধ জীর্ণ দুর্ব্বল পীতাভ পাতাগুলি বৃন্তচ্যুত হয়ে পড়ছে, ঘুরে ঘুরে নেবে আসছে মাটীর বুকে। ঝরা পাতায় পাতায় বনভূমির মাটী পড়ে গেছে ঢাকা।

বুড়ো শুকনো পাতা ঝরে যাচ্ছে, সবুজ কচি পাতা উৎসুক হয়ে উঠছে, কবে আবার ঝরা পাতার স্থানে নতুন কচি পাতা দেখা যাবে, তারই প্রতীক্ষায়। তারপর সবুজ পাতা যেদিন গজায় কচি পাতার সবুজ রংয়ের কোলে পীত আভা দেখা দিয়েছে,—ভাল করে নতুন পাতার সঙ্গে আলাপ জমাবার আগেই, দমকা বাতাস তাকে আঘাত করে ফেলে দেয় মাটীর পানে। নতুন পাতা তখন ঝরা পাতার স্থানে নতুন পাতা ওঠার প্রতীক্ষা করতে থাকে। এমনি ভাবেই পাতার জীবন কাটে, গাছ ঠিক থাকে। পাতা ঝরে আবার নতুন পাতা ওঠে, কত পুরানো পাখীর বাসা ঝড়ে উড়ে যায়, আবার নতুন পাখী এসে তার ডালে বাসা বাঁধে। শেষে গাছও একদিন মরে যায়, তার স্থানে আবার নতুন গাছ গজায়। সংহার ও সৃষ্টির খেলা চলে।

একটা ঝরা পাতা সরোজের কোলের উপর এসে পড়েছিল, সেটার পানে তাকিয়ে সরোজ এইসব কথা ভাবছিল, এমন সময় ডেভিডের গলা তার চিন্তা টুটে দিলে, শুনলে ডেভিড বলছে—আমি একটু ঘুরে দেখি যদি জল পাওয়া যায়—

সরোজ বললে—বেশ, যাও—

কতক্ষণ কেটে গেল, তৃষ্ণায় সকলের মুখ শুকিয়ে গেছে। অন্ততঃ এক চুমুক জল না পেলে প্রাণ বুঝি আর বাঁচে না। পলাতক যুবরাজ দারা, রাজপুতানার মরুভূমির মধ্যে একটু জলের জন্য যখন দিল্লীর সিংহাসনও ছেড়ে দিতে চেয়েছিল—এ ঠিক

তেমনই অবস্থা। একটু জল চাই—একচুমুক জল। তৃষ্ণাটা একটা প্রকাণ্ড দৈত্যের মত বুকটা যেন চেপে ধরেছে।

এই সময় গাছের আড়াল থেকে ডেভিডের আবির্ভাব হোল। সকলে উৎসুক হ'য়ে উঠলো, সরোজ জিজ্ঞেস করলো—জল পেলে?

ডেভিড বললে—জল পেয়েছি, কাছেই একটা ছোট নদী আছে। কিন্তু সেখান থেকে জল আনা বিপজ্জনক বলে মনে হচ্ছে।

সকলের দৃষ্টি জিজ্ঞাসু হয়ে উঠলো।

ডেভিড বলে চললো—নদীর ধারে গাছের আড়ালে অব্‌জারভেটারীর (observatory) মত একটা বাড়ী আছে। আসাম অঞ্চলে উঁচু-উঁচু খুঁটির উপর যেমন বাড়ী দেখা যায় এ-ও ঠিক সেই রকমের। বাড়ীটা থেকে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়, মাইলখানেকের মধ্যে নদীর তীরে গেলেই, সেই বাড়ীর লোক-দের চোখে পড়তে হবে। বাড়ীটা কিসের, কারা আছে, জানার জন্য আমি খানিকক্ষণ লুকিয়ে ছিলুম, দেখি একটা বন্দুক-ধারী যুবক এল—দেখে মনে হোল ওটা বোধ হয় সৈন্যদের একটা আড্ডা।

সরোজের মুখে চিন্তার ছায়া পড়লো। এই জঙ্গলের মধ্যে বন্দুকধারী যুবকদের যাতায়াত···সৈন্যদের আড্ডা···! বললে—যুবকটিকে কোন্ দেশের লোক বলে মনে হোল?

—গায়ের রং কালো, হয় সোমালী, না হয় হাবসী।

সরোজ চিন্তিতভাবে বললে—সোমালী হলে বড়ই বিপদের কথা, ওরা ইতালিয়ানদের হয়ে লড়ছে আমরা যদি ওদের হাতে পড়ি তাহলে ওরা আমাদের ইতালিয়ান ক্যাম্পেই নিয়ে যাবে—

আয়েষা এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল, এবার বললে—চলুন তো আমি একবার যাই আপনার সঙ্গে, আমি দেখলেই চিনতে পারবো—যদি সোমালীই হয়, তাহলে ওই এক জায়গাতেই ওরা নেই, এই বনের সর্ব্বত্রই ছড়িয়ে আছে—তাদের এড়িয়ে পালানো বড়ই কঠিন হবে!

আয়েষা উঠে দাঁড়ালো, সাবধানে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে এগিয়ে চললো ডেভিডের সঙ্গে।

বনের মাঝে গাছপালাকে পাশ কাটিয়ে একটা ছোট্ট নদী অনেক এঁকে বেঁকে বয়ে চলেছে। এগিয়ে যাবার পথে বার বার বাধা পেয়ে বেচারা বোধ হয় ভাল করে পুষ্ট হবার সুবিধা পায়নি, শীর্ণ দেহে জলের বুকে ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে এগিয়ে যাচ্ছে। সেই জলের পানে তাকিয়ে তৃষ্ণার্ত্ত আয়েষার মন এক গণ্ডূষ পান করার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। কিন্তু জলের কাছে যাবার উপায় নেই, তটভূমির দুপাশ এমন ফাঁকা যে লুকিয়ে জলে নাবার উপায় নেই।

নদীতীরের শেষ গাছটীর আড়ালে দাঁড়িয়ে ডেভিড দেখিয়ে দিলে, আয়েষার চোখে পড়লো গাছের পাতার আড়ালে

একখানি বাড়ী। কয়েকটী লম্বা লম্বা বাঁশকে খুঁটি করে দোতলা সমান উঁচুতে একখানি ঘর বাঁধা হয়েছে, ঘরখানি নদীর পাশে এমন একটা উঁচু ঢিবির উপর তৈরী যেন নদীর দুপাশে অনেক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে। বনের ভিতরেও সম্ভবতঃ কিছু কিছু দেখা যায়।

আয়েষা একদৃষ্টিতে সেই মঞ্চ-ঘরের পানে তাকিয়ে রইল, সেই ঘরটির মধ্যে কি রহস্য লুকানো আছে, জানার জন্য উৎসুক আকুলতা গুমরে উঠলো তার দু' চোখে, ইচ্ছা হোলো একবার ছুটে গিয়ে ওই ঘরখানির সব ক'টা জানালা দরজা খুলে একবার ভিতরটা দেখে আসে—কি আছে ওর মধ্যে; তারপর অঞ্জলি ভরে আকণ্ঠ জল পান। কিন্তু সাহসে কুলায় না প্রাণের মমতা মনের জোরকে দমিয়ে দেয়। যদি ওটা সত্যই ইতালিয়ান সোমালী সৈন্যদের আড্ডা হয়, তাহলে ওরই আশে পাশে অসংখ্য গুপ্ত-সেনা ছড়িয়ে আছে, একটা সঙ্কেতে চারিপাশের অসংখ্য ঝোপঝাড় থেকে অসংখ্য সৈন্যের শিরস্ত্রাণ উঁচু হয়ে উঠবে, অসংখ্য রাইফেলের সঙ্গীন ঝল্‌মল্‌ করে উঠবে। কয়েকটা তৃষ্ণার্ত্ত লোককে ধরার জন্য, অন্যায় বিচারে তাদের গুলি করে মারার জন্য এতো আয়োজন। অথচ তারা ইতালিয়ানদের কোন ক্ষতি করেনি, তবু, এরা তাদের বাঁচার অধিকার দেবে না। চোখের সামনে দিয়ে তরতর করে জল বেয়ে যাবে, কিন্তু সেই জল পান করতে গেলেই মৃত্যুকে বরণ করতে হবে, তৃষ্ণাতুর

মানুষের প্রতি মানুষের কি চমৎকার সহানুভূতি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণীর কি মহত্ব!

ঘরখানির যেটুকু দেখা যায়; সামনে একটু বারান্দা, এ পাশে একটা জানালা। খানিকক্ষণ পরে সহসা যেন মনে হোলো, জানালার পাশ দিয়ে কে একজন চলে গেল, একটু পরেই বারান্দায় এসে দাঁড়ালো একটী মেয়ে, কিছু পরেই একটী ছেলে এসে মেয়েটীর পাশে দাঁড়ালো। ছেলেটীর মাথায় কতকগুলি শাদা পালক বাতাসের ঢেউয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

তাদের দেখেই আয়েষা ঝোপের আড়াল থেকে মাথা তুলে দাঁড়ালো, বললে—যাক্, এবার একটু জল খেয়ে বাঁচি!

তারপর যেই সে নদীর দিকে একপা এগুতে যাবে, অমনি ডেভিড তার হাত চেপে ধরলে, বললে করেছেন কি, ওরা যে দেখতে পাবে!

—পেলেই বা, ওদেরকে ভয় কিসের?

—তার মানে?

—তার মানে, ওরা সোমালী সৈন্য নয়, ওরা বর-কনে।

—বর-কনে? এই জঙ্গলের মধ্যে?

—হ্যাঁ, "দানাকিলের" বর-কনে। ওদের প্রথা হচ্ছে বিয়ের পর বর-কনে আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে দূরে কোথাও সাত দিন নির্জ্জন-বাস করে, ওরাও বোধ হয় সেই জন্যই এখানে

এসেছে। ওদের সঙ্গে সাত দিনের মত খাবারও আছে, চাইলে কিছু পাওয়াও যেতে পারে—

ডেভিড বললে—কিন্তু চাইবে কে? আমাদের কথাতো ওরা বুঝবে না।

—আপনাদের কথা না বুঝলেও আমার কথা বুঝবে, বলে জল পান করার জন্য আয়েষা নদীতে গিয়ে নাবলো।

আয়েষা ও ডেভিড অঞ্জলি ভরে আকণ্ঠ জলপান করলে। শীতল জল গলাধঃকরণ হবার সঙ্গে সঙ্গে বুক তৃপ্তিতে ভরে উঠে, সব পরিশ্রান্তি এক-মুহূর্ত্তে লুপ্ত হয়ে যায়, মনে হয় প্রতি জলবিন্দুটী যেন একটী অমৃতের কণা, দেহে নতুন জীবন সঞ্চার করে। পরম তৃপ্তিতে মুখ থেকে আপনিই উচ্চারিত হয়—আঃ!

জলপান শেষে আয়েষা নদীর তট ধরেই সেই ঘরখানির দিকে অগ্রসর হোল। ছেলেটী ও মেয়েটী এতক্ষণ বিশেষ ভাবে তাদের লক্ষ্য করছিল, এবার তারা তাদের ঘরের দিকেই আসছে দেখে ছেলেটী ঘরের ভিতর থেকে একটী বন্ধুক নিয়ে এল, তারপর সেই সঙ্কীর্ণ বারান্দাতেই বন্ধুকটী হাতে নিয়ে হাঁটুর উপর বসলো। তার হাবভাব দেখে ডেভিড বললে—সর্ব্বনাশ, গুলি করবে নাকি!

—তা করতেও পারে,—আয়েষা বললে,—আমাদের পরণে ইতালিয়ান পোষাক, তার উপর আপনার কাঁধে একটা বন্ধুকও

ঝুলছে—এই সব দেখে বেচারা যদি ভয় পেয়ে গুলি ছোড়ে সেটা কি খুব অন্যায় হবে!

…ন্যায় অন্যায় বুঝিনে, আমায় গুলি ছুড়লে আমিও ছাড়বো না, বলে ডেভিড কাঁধের বন্দুক হাতে নাবিয়ে নিলে।

আয়েষা হেসে বললে—অত ব্যস্ত হবেন না, গুলি করলেই হোল নাকি, আমি আছি কি জন্যে?

এই বলে ছেলে ও মেয়েটীকে লক্ষ্য করে আয়েষা আম্‌হারিক ভাষায় কি বলে চীৎকার করে উঠলো।

সেই চীৎকার শুনে ছেলেটী ও মেয়েটী আরেকবার ভাল করে তাদের পানে তাকালো, তারপর সিঁড়ি বয়ে নীচে নেবে এল। আয়েষা তাদের কাছে এগিয়ে গেল। খানিকক্ষণ কি কথা হোল। প্রথমে বোধহয় আয়েষাকে ভারতীয় বলে তারা বিশ্বাস করতে চায়নি, শেষে আয়েষা যখন মাথা থেকে টুপীটা খুলে মাথার দীর্ঘ কালো চুলগুলি দেখিয়ে দিলে, তখন তার চুলের কালো রং দেখে তারা ভারতীয় মেয়ে বলে বিশ্বাস করলে।

কথা শেষ করে আয়েষা যখন ডেভিডের কাছে গেল, ডেভিড জিজ্ঞেস করলে—কি হোল?

আয়েষা বললে—ওদের কাছে আর খাবার নেই, সাতদিনের যে খাবার ওরা সঙ্গে এনেছিল, তা ফুরিয়ে গেছে। আজ ওদের ফিরে যাবার দিন। এক্ষুনি ফিরবে, আমরা ইচ্ছা করলে

ওদের সঙ্গে যেতে পারি। ওরা বলছে ওদের গ্রাম বেশীদূরে নয়, ওদের সঙ্গে গেলে ওরা আমাদের খাওয়াতে পারে।

ডেভিড বললে—শেষে বন্দুকের গুলি খাওয়াবে না তো?

আয়েষা বললে—না না, ওরা অসভ্যদেশের কালো লোক, সভ্যতার অতো ছলচাতুরী ওদের মধ্যে নেই। তাছাড়া আমরা ভারতের লোক শুনে ওদের আনন্দ হয়েছে, ভারতীয়দের ওরা ভালবাসে।

—বেশ তবে তাই চলো—

—আমি তা আগেই ওদের বলেছি, বলে আয়েষা হাব্সী বরকনেকে কাছে ডাকলো, তারপর সকলে মিলে চললো সরোজদের কাছে।

সাতজন যাত্রী।

বরকনের নির্দ্দেশে সরোজরা চলেছে।

বনের প্রান্ত যেখানে ঊষর প্রান্তরের সঙ্গে মিলেছে, সেখান থেকেই একটা বিপর্য্যস্ত ভাব চোখে পড়ে সুদূর দিগ্বলয় পর্য্যন্ত। ইতস্ততঃ মাটী ফেটে গেছে, এখানে সেখানে ছোট বড় গর্ত্ত। কাছাকাছি বোধ হয় একটা গ্রাম ছিল, বোমার বিস্ফোরণে তার সবই লুপ্ত হয়ে গেছে, দাঁড়িয়ে আছে শুধু কয়েকটা বাঁশের খুঁটি। মানুষও হয়তো কত পড়ে আছে এখানে সেখানে, কিন্তু দূর থেকে লক্ষ্য করার মত দৃষ্টি তাদের নেই। প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে একটি সরু পায়ে-চলা পথ রেখা ধরে তারা এগিয়ে চলেছে। প্রায়-সমতল জমি, চলার কষ্ট নেই।

চলতে চলতে হাবসী-বরের পায়ের কাছে একটা ছোট টেনিস বলের মত কি পড়ে থাকতে দেখা গেল। সরোজ ছুটে গিয়ে বন্দুকের কিরিচ দিয়ে সেটাকে হকি খেলার কায়দায় সট্ করে দিলে। হাত কয়েক যেতে না যেতেই বলটা একটা ঢিবিতে লেগে লাফিয়ে উঠলো, তারপরেই একটা তীক্ষ্ণ শব্দ ও খানিকটা ধোঁয়া!

সেটা বল নয় একটা ছোট বোমা। খানিকটা দূরে গিয়ে ফাটলো, তাই রক্ষা; কাছাকাছি ফাটলে প্রাণান্তকর হোত।

গন্ধকের পীতাভ ধোঁয়া আস্তে আস্তে অপসারিত হয়ে গেল, বাধা-পাওয়া দৃষ্টির সামনে আবার তেপান্তরের মাঠ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আর সেই প্রান্তরের বুকে ফুটে উঠলো কয়েকটা নরমুণ্ড। আর তারই সঙ্গে কয়েকটা বন্দুকের নল। বোমা ও কামানের গোলা পড়ে জমির যে সব স্থানে বড় বড় ফাটল হয়েছে, তারই মধ্যে বন্দুকধারী সৈনিকের দল লুকিয়ে আছে সুযোগের সন্ধানে। কোথা থেকে বোমা পড়লো, কোথায় ফাটলো, কারা বোমা ফেললে, তাই দেখবার জন্য তারা মাথা বাহির করেছে, আর সেই মাথাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য হাতের বন্ধুকটাও তুলে ধরেছে।

সরোজরা প্রথমে সচকিত হয়ে উঠেছিল।—এরা শত্রু না মিত্র?

ইতিমধ্যে বর-কনে তাদের দেখেই আনন্দে চিৎকার করে উঠলো, হাত তুলে তাদের অভ্যর্থনা জানালে।

সামনের দল থেকে সে চিৎকারের প্রত্যুত্তরও পাওয়া গেল। পর-মুহূর্ত্তেই একজন হাবসীকে গর্ত্ত থেকে লাফিয়ে উপরে উঠতে দেখা গেল; তার মাথার জমকালো পালকের মুকুট দেখলে, তাকে দলপতি বলে মনে হয়।

লোকটী কাছে এল, বর তার সঙ্গে সরোজদের পরিচয় করিয়ে দিলে—ইনিই এখানকার 'গ্যারাজ্‌ম্যচ্‌', মানে সৈন্যাধ্যক্ষ। আর এঁরা হচ্ছেন ভারতীয় ভ্রমণকারী,—

গ্যারাজ্‌ম্যচের ভ্রূকুটী একবার কুঁচকে উঠলো, জিজ্ঞেস করলে—ভারতবর্ষের লোক, তবে ইতালিয়ান পোষাক কেন ?

হাবসীরা ইংরাজী জানেনা, ভাঙা ভাঙা ফরাসী ভাষায় সর্দ্দার তাদের এই কথাগুলি জিজ্ঞেস করলে, আয়েষা ফরাসী ভাষাতেই উত্তর দিলে, বললে—ইতালিয়ানরা আমাদের স্পাই বলে ধরে নিয়ে গিয়ে কোর্ট-মার্শাল্‌ করেছিল, কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি। সে অনেক কথা, পরে শুনবেন। কাল সারাদিন কিছুই খাওয়া হয়নি। আপনারা যদি আগে আমাদের কিছু খেতে দেন !

—অবশ্যই দেবো, তবে আপনাদেরকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। এখানে তো কিছুই নেই, কাছেই আমাদের গাঁ···

—বেশ, চলুন !

প্রান্তরের এক প্রান্ত ক্রমশঃ ঢালু হায় নীচে নেমে গেছে, আবার উপর দিকে উঠে গেছে, যেন জলতরঙ্গ, সাগরের ঢেউয়ের জল সহসা জমে কঠিন মাটী হয়ে গেছে বুঝি !

সেই ঢালু জমির একপাশে বনের সীমান্ত এসে মিশেছে। সেই সব গাছপালার ছায়ায় কয়েকখানি বাড়ী, গোল গোল খড়ের ছাদগুলি গম্বুজের মত উপর দিকে উঠেছে, দূর থেকে

এক একখানি বাড়ীকে এক একটী এদেশী ধানের গোলা বলে মনে হয়।

গ্রামখানি পরিত্যক্ত, হাবসী ছেলেমেয়েরা প্রাণের মায়ায় ঘর বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে, এটী এখন সৈনিকদের একটী সেনা-নিবাসে পরিণত হয়েছে।

গ্যরাজ্ম্যচ্ একটী বাড়ীতে এনে সরোজদের বসালো। জল এল হাতমুখ ধোবার জন্য, প্যান্ট ও শার্ট এল বেশ পরিবর্ত্তনের জন্য, এক এক কাপ কফি ও খান কতক করে বিস্কুট এল, মানে, আদর আপ্যায়ন ও খাতিরের চূড়ান্ত।

গ্যরাজ্ম্যচ্ কথায় কথায় বললে—ইতালিয়ানরা খুব কাছে এসে পড়েছে, পরশু থেকে তারা এই অঞ্চলে প্রচুর বোমা ফেলেছে, গ্রামের লোকেরা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেছে, আমাদের সৈন্য না এসে পড়া পর্য্যন্ত, আমাকেই এখন এ দিকে ইতালিয়ানদের ঠেকিয়ে রাখতে হবে—

ডেভিড জিজ্ঞেস করলে—আপনার অধীনে কত লোক আছে?

—প্রায় দুশো!

—কামান?

—দুটো।

—দুশো লোক আর দুটো কামান নিয়ে আপনারা ইতালিয়ান সৈন্যদের রুখতে পারবেন?

—কেন পারবো না? তারা ভাড়াটে সৈন্য, এসেছে

আমাদের দেশ লুট করতে, আর আমরা লড়ছি আমাদের দেশের জন্যে, আমাদের ছেলে-মেয়ে ভাই-বোনদের জীবন রক্ষা করতে,—তাদের চেয়ে কি আমরা বেশী লড়তে পারবো না?

সরোজ বাধা দিয়ে বললে—কিন্তু এখনকার লড়াই তো গায়ের জোরে হাতাহাতি নয় যে, বেশী লোক থাকলে ভাল করে লড়লেই জিতবে! এখন হচ্ছে কল-কব্জার লড়াই, দুটী লোক যদি একখানি বোমারু এরোপ্লেন নিয়ে উপর থেকে পাঁচশো পাউণ্ডের বোমা ফেলতে সুরু করে, তাহলে নীচে দু'হাজার সৈন্য, যত ভাল লড়িয়েই হোক না কেন, এক ঘণ্টাতেই শেষ!

গ্যরাজ্‌ম্যচের মুখখানি বিষণ্ণ হয়ে গেল, বললে—আমাদের যে একেবারে উড়ো-জাহাজ নেই—তাতো নয়, আমাদের কয়েকটী উড়ো জাহাজ তো আছে!

ইতালির বিমান-বহরের তুলনায়, আবিসিনিয়ার বিমান-বহর কিছুই নয়, সরোজ ও ডেভিড খবরের কাগজেই তা পড়েছিল, কিন্তু এখানে সে-কথার উল্লেখ করে গ্যরাজ্‌ম্যচের মনে আঘাত দেবার ইচ্ছা সরোজের আদৌ ছিল না, সে চুপ করে রইল। গ্যরাজ্‌ম্যচ্‌ তার মুখের পানে তাকিয়ে তার মনের কথাটা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল, বললে—আমরা কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত লড়বোই। একটী হাবসী জোয়ান বেঁচে থাকা পর্য্যন্ত ইতালিয়ানরা আবিসিনিয়া ভোগ করতে পারবে না।—আমরা জীবন দেব, কিন্তু জন্মভূমি দেব না!

ইতিমধ্যে একজন সৈনিক ছুটে এল, এমন ব্যস্ত ব্যাকুল তার ভাব যে গ্যারাজ্‌ম্যাচ্‌কে প্রথমে যে স্যালুট দেওয়া প্রয়োজন, সে কথাটা সে ভুলেই গেছিল, কাছে এসেই গরগর করে সে অনেক কথাই বলে গেল, যার একটী বর্ণ. সরোজ-ডেভিড্‌ কেউই বুঝলো না।

সব শুনে গ্যারাজ্‌ম্যাচ. ফরাসী ভাষায় সরোজদের বললে—নিন্‌ উঠে পড়ুন, আজ আপনাদের বরাতে আর কোন খাবারই জুটবে না—

—কি—কেন ? কি হয়েছে ?

—আকাশের গায় ইতালিয়ান প্লেন দেখা দিয়েছে, তারা এদিকে আসার আগেই আমাদের গা ঢাকা দিতে হবে, নাহলে বোমার মুখ থেকে একটী লোকও বাঁচবে না—এই সব বাড়ী ঘর এখুনি ভূমিস্যাৎ হয়ে যাবে···

এর পর আর কথা নেই। সকলে উঠে পড়লো। খান কতক রুটি ভাজার আয়োজন হচ্ছিল, সে-সব সেখানেই পড়ে রইল। এক বেলা না-খেলে খাবার সময় পাওয়া যাবে, কিন্তু একবার বোমার নীচে পড়লে আর জীবন ফিরে পাওয়া যাবে না।

বাতাসে মৃদু গুঞ্জন-ধ্বনি শোনা গেল, অনেকগুলি ভ্রমর যেন মধুর খোঁজে ফুলের চারিপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

গর্জ্জন ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠলো। যে

শব্দকে মধু-পিয়াসী অলির গুঞ্জন ভেবে ভুল করা চলতো, দেখা গেল তা ধ্বংস-প্রয়াসী প্লেনের প্রপেলারের চীৎকার। আকাশের এক কোণ থেকে ন'খানি করে বোমারু প্লেনের এক একটা ছোট ছোট স্কোয়াড্রন উড়ে আসছে। একটী দলের পিছনে আর একটী শকুনির মত আকাশের বুকে পাখা ভাসিয়ে দুর্ব্বার বেগে প্লেনগুলি এগিয়ে আসছে। তাদের গতির পানে তাকিয়ে চুপ করে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে থাকা ছাড়া হাবসীদের করার কিছুই নেই।

—কর্‌র্‌র্‌—বুম্‌ম্‌, বুম্‌ বুম্‌ বুম্‌ম্‌!

প্লেনগুলি মাথার উপর দিয়ে উড়তে উড়তে বোমা বৃষ্টি সুরু করলো। ছোট ছোট বোমাগুলি অজস্র ধারায় পড়তে লাগলো। যে ঘরখানিতে সরোজরা আশ্রয় নিয়েছিল, একটী বোমা ফেটে তার চালায় আগুন ধরে গেল। দেখতে দেখতে আরো কয়েকটী বোমা তার চারিপাশের সব ক'খানি চালাঘরকে অগ্নিময় করে তুললো। কিছুই আর নেই তথাপি ফাঁকা মাঠের উপর বোমা পড়ছে অবিরাম। চারিপাশে শুধু বোমা ফাটছে,—মাটীকে উৎক্ষিপ্ত করছে, ধূলো ওড়াচ্ছে, ধোঁয়ায় দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে ফেলছে, শব্দে কান বধির করে তুলছে!

প্রতি মুহূর্ত্তে শুধু মৃত্যুর জন্য শান্ত প্রতীক্ষা, যে কোন নিমেষে ঝোপটীর উপর একটী বোমা পড়লেই সব শেষ।

মনে হয়, একএকটী মুহূর্ত্ত যেন মৃত্যুর এক একটি পরিচ্ছেদ,

আর এগুতে চায় না,—অবিশ্রাম গতিশীল অনন্তকাল সহসা যেন থেমে গেছে। কুণ্ডলী-পাকানো গন্ধকের ধোঁয়া ভেদ করে চোখ আর কিছু দেখে না, বিস্ফোরণের শব্দ কাণকে আর চমকে দিচ্ছে না, মাঝে মাঝে ধোঁয়া-ভেদী আগুনের শিখা হৃদয়কে আর দুরদুর করে কাঁপিয়ে তুলছে না। কাঁধের উপর বন্দুকটা ঝুলছে, হাতে তুলে নিতে ইচ্ছে করছে না। বিনয়বাবুর মুখখানি অনেক করেও আর ভাল মনে পড়ছে না, কিছুই আর ভাল লাগে না, সব বোঝবার, জানবার, উপলব্ধি করবার বাইরে তাদের মন চলে গেছে, তাদের মনের ও চিন্তাধারার মৃত্যু হয়েছে।

* * * *

বিস্ফোরণের পিতাভ ধোঁয়া যখন সরে গেল, তখন তার পশ্চাতে দেখা গেল, লেলিহান অগ্নিশিখা, পরিত্যক্ত কুটীর-গুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে ব্যস্ত। মাথার উপর ইতালিয়ান প্লেন আর নেই, দিগ্বলয়ের মধ্যে তাদের ধূমেল্ রেশটুকুও আর চোখে পড়ে না, আকাশ মেঘমুক্ত, পরিষ্কার। চারিপাশ আবার শান্ত স্তব্ধ।

বোমাহত অসমতল প্রান্তরের পানে তাকিয়ে গ্যরাজ্‌ম্যাচ্ বিউগিল্‌এ ফুঁ দিলেন, সমস্ত প্রান্তর ও বনানী প্রতিধ্বনিত করে শিঙ্গার ধ্বনি উঠলো—ভঁপো, ভঁপো, পোঁ—

ডাক শুনে একে একে হাবসী সৈনিকেরা এল, সার দিয়ে

যখন তারা দাঁড়ালো, গ্যারাজ্ ম্যাচ্ একবার তাঁদের পর্য্যবেক্ষণ করেহিসাব করে নিলেন, তারপর সরোজের পানে ফিরে বললেন—বিয়াল্লিশ জনকে হারিয়েছি!

সরোজ বললে— হারিয়েছি মানে!

গ্যারাজ্ ম্যাচ্ বললে—আমার বিউগিল্ শুনে তারা আসতে পারেনি, হয় তারা মরেছে, নাহলে মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে—

—আহতদের জন্য কি ব্যবস্থা করবেন?

—কিছুই না, ওষুধপত্র ডাক্তার কিছুই এখানে নেই, তাছাড়া তাদের যে হেড্ কোয়ার্টারে নিয়ে যাব, তারও উপায় নেই, কুড়ি মাইল পথ, তাদের বয়ে নিয়ে যেতে অনেক সময় লাগবে, ততক্ষণে আমরা সকলেই হয়তো আরেক-দফা বিমান আক্রমণে প্রাণ হারাব, বিয়াল্লিশ জনের জন্য দেড়শো সৈনিককে বিপন্ন করতে পারিনা!

—কিন্তু....?

কিন্তুর কিছুই নেই, আমরা দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছি, যারা গেল, তাদের পানে তাকাবার ফুরসুৎ তো আমরা পাচ্ছি না, প্রচণ্ড শত্রুর বিরুদ্ধে অমন কত বিয়াল্লিশ জন যাবে, প্রাণ তো আমাদের বড় নয়, প্রাণের চেয়েও দেশ আমাদের কাছে বড়, বলে গ্যরাজ্‌ম্যচ্‌ সৈনিকদের পানে তাকালেন, তারপর আদেশ দিলেন শ্রেণী! ডাইনে সাজ্‌—ও।

দু'সারি সৈনিক একে অন্যের কাঁধে হাত দিয়ে, দুটা সোজা লাইন হয়ে গেল।

আদেশ হোল—বাঁয়ে ফের—ও, ত্রজেৎ!

:

সৈনিকের মার্চ্চ সুরু হোল!

দীর্ঘ মার্চ্চ। কুড়ি মাইল পথ। পূরো চারটি ঘণ্টা বোমা-ফাটা উঁচু নীচু প্রান্তরের বুকের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া বড় সহজ কথা নয়। এতটুকু 'বিরতি নেই' শুধু—লেফ্‌ট্‌—রাইট্‌—লেফ্‌ট্‌! মার্চ্চ করবার অভ্যাস থাকলেও, চলতে চলতে পায়ের শিরায় টান ধরে, নিশ্বাস ঘন ঘন বইতে থাকে! প্রচণ্ড গ্রীষ্মের রোদ উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে মানুষগুলোকে যেন পুড়িয়ে দিতে চায়, ঘামে সর্ব্বাঙ্গ ভিজে ওঠে। রোদের তীব্রতায় চোখ চাওয়া যায় না, মাথার মধ্যে যাতনা সুরু হয়। শরীর শুধু 'জল জল' করে ওঠে, তথাপি মার্চ্চের বিরতি নেই। শিক্ষিত

সৈনিকের দল কোন কষ্টকেই কষ্ট বলে মানে না, শুধু তারা জানে উদ্দাম বেগে সামনে এগিয়ে যেতে, সামনের সব কিছু বাধা বিপত্তি, কামানের গোলায় আর সঙ্গীনের খোঁচায় সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলতে, তাদের কানে শুধু বাজে—'লেফ্‌ট্‌ রাইট্‌ লেফ্‌ট্‌...লাই ডাউন (শুয়ে পড়)...এম্‌—ফায়ার (লক্ষ্য কর, গুলি ছোড়)...চার্জ্জ ফরোয়ার্ড (সামনে আক্রমণ কর)।...'

সৈনিকের দল মার্চ্চ করে চলে, পিছনে গ্যারাজ্‌ম্যাচের সঙ্গে সমতালে পা ফেলে সরোজরাও অগ্রসর হয়।

প্রান্তর সম্বন্ধে নতুন করে বলার কিছু নেই, মাঝে মাঝে দু' পাঁচটী আগাছা ছোট-ছোট ঝোপের সৃষ্টি করেছে। এখানে সেখানে দু' একটা বড় বড় গাছও চোখে পড়ে, গ্রীষ্মের রোদে ও ঝড়ে তার পাতাগুলি ঝরে নিঃশেষ হয়ে গেছে, শাখা প্রশাখা অনুশাখা আকাশের পানে শুধু তাকিয়ে আছে মাথা তুলে। ওদিকে সেই ছোট নদীটী উপবীতের মত প্রান্তরের বুকের উপর দিয়ে গিয়ে দূরে কোন অজানা সীমায় মিশে গেছে, তার দু তটে কিসের যেন সারি সারি ক্ষেত দেখা যায়, ঠিক ঠাহর হয় না!

নির্ব্বিকার যন্ত্রের মত সৈন্যের দল মার্চ্চ করে চলে, পরণে জুতো নেই, তালে তালে পা-ফেলার শব্দও হয় না!

হাবসীদের তাঁবু পড়েছে এক বিরাট জঙ্গলের গা-ঘেঁষে, একপাশে ফাঁকা প্রান্তর, চাষের জমি, আরেক দিকে দীর্ঘ বড় বড়

গাছ। একদিকে দৃষ্টি সুদূর সীমান্তে আকাশের গায়ে গিয়ে বাঁধা পায়, আরেক দিকে মাথার উপর গাছের পাতা ভেদ করে আকাশে দৃষ্টি পৌঁছায় না। এক ধারে ফাঁকা প্রান্তরে সূর্য্যের আলো ঝলমল করছে, আরেক ধারে বনানীর পাতার ব্যূহ ভেদ করে চির-আবছায়া।—এই দুয়ের মাঝে খাকী রংয়ের তাঁবুগুলো একটী সীমার রেখা টেনে দিয়েছে যেন।

তাঁবুর পাশে বনের প্রান্তে একটী বড় গাছ তলায় কয়েকখানি বেতের মোড়ায় কজন লোক বসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন সাহেবও ছিলেন। গ্যারাজ্ম্যচ্ এগিয়ে গিয়ে সাহেবকে খানিকক্ষণ কি বললে, সাহেব উঠে এসে সরোজদের বললে—গুড্ মর্ণিং, ডিয়ার ফ্রেণ্ডস্! শুনলুম আপনারা ইণ্ডিয়ানস্?

—হ্যাঁ, আপনি?

—বেল্জিয়ান্।

গ্যারাজ্ম্যচ্ পরিচয় দিয়ে দিলে—ক্যাপ্টেন মোজারিক্ জনসন, এখানকার অফিসার কম্যান্ডিং।

সরোজ ডেভিড প্রভৃতি একে একে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে করমর্দ্দন করলে।

ক্যাপ্টেন জন্সন্ লোক ভাল। তাঁর আদর আপ্যায়নে, কথায় বার্ত্তায় এমন হৃদ্যতা ও সরলতা আছে, যা সহজেই লোককে ঘনিষ্ট করে তোলে। কোথাও এতটুকু সেনাপতিত্ব-'হাম্বড়া' ভাব কখনও ফুটে ওঠে না।

ক্যাপ্টেনের অধীনে হাজার পাঁচেক সৈন্য আছে, কয়েকটী মেশিন-গানও আছে।

গাছতলায় বসে বসে কফি খেতে খেতে ক্যাপ্টেন বললেন —আমাদের কাছে এসে পড়েছেন, ভালই হয়েছে. দুনিয়া সম্বন্ধে কথা বলার তবু ক'জন লোক পেলুম। এই অঞ্চলে কথা বলার মত শিক্ষিত হাবসী নেই। নিজেদের অশিক্ষিত করে রেখেই এরা নিজেদের বিপদ ডেকে এনেছে। না হলে, আজ কি ইতালিয়ানরা এদেশ আক্রমণ করতে সাহস পেত?

—এই লড়াইয়ের কি ফল হবে বলে আপনার মনে হয়? —ডেভিড জিজ্ঞেস করলে।

—ইতালিয়ানরাই জিতবে! লক্ষ লক্ষ হাবসী প্রাণ দিয়ে লড়ছে, কিন্তু এ লড়াইয়ের কোন মূল্যই নেই। এ এরোপ্লেনের যুগ। দু' হাজার লোককে দু ঘন্টার মধ্যে দুটি লোক বোমা ফেলে নিশ্চিহ্ন করে দেবে, দু' হাজার লোকের গায়ে যত জোরই থাক না কেন, কোন কাজে আসবে না, এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেলবে আর মারবে।

—আপনাদের কি মোটেই প্লেন নেই?

—আছে কিন্তু সংখ্যায় বড় কম তার উপর হাবসীরা এরোপ্লেন কেউ চালাতেই জানে না, যে কজন বৈমানিক আছেন তাঁরা ডাচ্ আমেরিকান না হলে রাশিয়ান।

—এরোপ্লেন না থাক, এরোপ্লেন-মারা কামানের ব্যবস্থা করেন নি কেন ?

—ব্যবস্থা তো করেছিলুম, বিদেশে কতকগুলি কামানের অর্ডারও দিয়েছিলুম। কিন্তু লিগ্ অফ্-নেশন্সুয়ে (league of nations) ইতালির ভয়ে জাপান, জার্ম্মাণ, ইংরাজ ও ফরাসী শান্তির বৈঠক বসিয়ে আমাদের যুদ্ধের উপকরণ পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে! আফ্রিকার এই একমাত্র স্বাধীন দেশকে পরাধীন করার জন্য তারা সবাই শঠ্ করছে!

কথা বলতে বলতে ক্যাপ্টেন থেমে গেলেন, উঠে পড়ে সামনের দিকে তিনি ক' পা এগিয়ে গেলেন, সকলে তাঁর অনুসরণ করে দেখলো, একটী কালো ঘোড়ায় চড়ে একটী লোক সে দিগ্বলয়ের প্রান্ত থেকে ছুটে আসছে। এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ছোট খেলা ঘরের ঘোড়সওয়ার ধীরে ধীরে সত্যিকারের হয়ে উঠছে। ঘোড়াটী ও মানুষটী ইস্প্রিঙের দম দেওয়া পুতুলের মত নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছে—কালো ঘোড়ার পিঠে কালো একটী মানুষ।

ঘর্ম্মাক্ত অশ্বারোহী ক্যাপ্টেন জন্সনের সামনে এসে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলো। স্যালুট করে একখানি চিঠি দিলে ক্যাপ্টেনের হাতে।

চিঠি পড়ে ক্যাপ্টেনের ভ্রূ কুঁচকে উঠলো, পত্রবাহকের মুখের পানে তাকিয়ে তিনি কি ভাবলেন, তারপর তাড়াতাড়ি

এগিয়ে এসে একটা সৈনিককে কি আদেশ করলেন, তারপর একবার সরোজদের কাছ পর্য্যন্ত এগিয়ে এসে অস্থির ভাবে আবার তাঁবু পর্য্যন্ত ফিরে গেলেন।

তাঁবুর ভিতর থেকে একখানি প্ল্যান হাতে নিয়ে ক্যাপ্‌টেন বাহিরে এল, সরোজদের সামনে মাটীর উপর প্ল্যানটা ছড়িয়ে দিয়ে, বললে— পূব্‌ দিকে ইতালিয়ানরা পাঁচ মাইলের মধ্যে এগিয়ে এসেছে, আজ রাতেই এখান থেকে সরিয়ে নিতে হবে, এই ফাঁকা মাঠে তাদের সঙ্গে লড়াই করা চলবে না···

সরোজ বললে—কেন এই জঙ্গলের আড়াল থেকে গরিলা যুদ্ধ চালাবেন ?

—সে তো চালাতেই হবে, ক্যাপ্‌টেন বললে, কিন্তু সে কতক্ষণের জন্যই বা, বিষ-গ্যাস ছাড়লেই সব ঠাণ্ডা···

—কেন গ্যাস মুখোস ?—ডেভিড বললে।

—আমাদের নেই—বলে ক্যাপ্‌টেন সহযোগীদের ডেকে একটার পর একটা আদেশ দিতে লাগলেন। বিউগিলের শব্দে সেই আদেশ তাঁবুর এক দিক থেকে আর একদিকে পৌঁছে গেল। অসংখ্য সৈনিক চঞ্চল হয়ে উঠলো। চারিপাশে তাড়া হুড়া—তাঁবুর দড়ির পট্‌ পট্‌ শব্দ···কামানের চাকার ঘর্ঘর···সৈনিকদের চঞ্চল সজীবতা···আসন্ন যুদ্ধের বারতায় চারিপাশে বাতাসকে ভারী করে তুললে।

তাঁবু তুলে নিয়ে, বন্দুক, কামান ও আর সব জিনিষপত্র নিয়ে

সৈনিকের দল ফাঁকা মাঠের সীমান্ত থেকে যাত্রা করার জন্য তৈরী হোল।

আরেকটী ছোট দল গাছের আড়ালে আড়ালে কামান পেতে তৈরী হতে লাগলো, ইতালিয়ানরা যদি আক্রমণ করে, সেখানে তাদের খানিকক্ষণ ঠেকিয়ে রাখবে, অপর বাহিনীটা যাতে ততক্ষণে নিরাপদে প্রান্তর পার হয়ে 'দেশী'তে গিয়ে পৌঁছাতে পারে।

হঠাৎ সৈন্যদলের মধ্যে চীৎকার উঠলো।

কথাটা শুনে ক্যাপ্‌টেন্‌ একটু বিচলিত হয়ে পড়লেন। বাইনোকিউলারটা নিয়ে পূব্‌দিকের আকাশটা ভাল করে পর্য্যবেক্ষণ করলেন, তারপর একজন আরদালীকে ডেকে কি আদেশ্‌ করলেন, অল্পক্ষণের মধ্যেই বিউগিল্‌ বাজলো—পোঁ—ভোঁপো—ভোঁ—!

সৈন্যদল শিবির তুলে স্থান ত্যাগের আয়োজন করছিল, বিউগিলের সঙ্কেতে তারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো; যেখানকার—যা জিনিষপত্র রইল পড়ে, পিঠের ঝোলা আর কাঁধের বন্দুক নিয়ে তাড়াতাড়ি সব এসে ঢুকলো পাশের জঙ্গলে, গাছের আড়ালে, পাতার আবছায়ায়।

মিনিট কয়েক মধ্যেই ফাঁকা প্রান্তরে আর একটী লোককেও দেখা গেল না।

কতক্ষণ পরে আকাশের সীমায় একখানির পর একখানি

প্লেন দেখা দিল, বাতাসের ঢেউয়ে ভেসে এল মৃদু গুঞ্জনের রেশ ধীরে ধীরে, প্রতীক্ষ্যমান সৈন্যদলের মাথার উপরে ভেসে এল পর পর তিনটী স্কোয়াড্রণ। এক একটী স্কোয়াড্রণে ন'খানি করে প্লেন—আগে একখানি, পিছনে দুখানি দুখানি করে বাকী আটখানি।

মাথার উপর এসে প্লেনগুলি যেন একবার থমকে দাঁড়ালো, পড়েথাকা তাঁবু আর জিনিষপত্রগুলো বুঝি একবার দেখে নিলে, তারপর আবার এগিয়ে চললো।

রবিদত্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে—যাক্, এবার তাহলে আমরা ওদের চোখে ধূলো দিয়েছি—

ক্যাপ্‌টেন্ হেসে বললেন—ধূলো ঠিকই দিয়েছেন তবে ধূলোর সঙ্গে কিছু বালি ছিল, সেগুলো বেচারাদের চোখে পড়ে বড় করকর করে কষ্ট দিচ্ছে, তাই এখুনি বোমা ফেলে তারা তার শোধ নেবে।

—ওরা আমাদের দেখতে পায়নি তবু—

—দেখতে পায়নি বটে কিন্তু আমরা কোথায় আছি তা তারা বুঝেছে। এই অঞ্চলে বিশ মাইলের মধ্যে আর কোথাও সৈন্যদের ছাউনি পড়েনি।

—তবে যে ওরা চলে গেল ?

—একটু এগিয়ে গিয়ে দেখছে আমাদের অবস্থাটা কি, তারপর ফিরে এসেই বোম্বার্ডমেণ্ট সুরু করবে।

ক্যাপ্‌টেন্ ঠিকই বলেছিলেন। ইতালিয়ান প্লেনগুলি দিগ্বলয়ের সীমা পর্য্যন্ত গিয়ে ফিরে এল। মাথার উপর আকাশের গায়ে প্লেনগুলি নিজ নিজ জায়গা ঠিক করে নিলে। তারপর অরণ্য আর তার চারিপাশের প্রান্তরে সুরু হোল অজস্র বোমাপাত—বুম্! বুম্!! বুম্!!!

শুধু বোমা আর বোমা। বৃষ্টিধারার মত অজস্র বোমার ধারা। কোনটা মাটিতে পড়ে, কোনটা গাছের ডালের সংঘাতে ফেটে যাচ্ছে। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক ধূমায়িত হয়ে উঠেছে। কাণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এপাশে। ওপাশে। মাথার উপর। শুধুই—বুম্-বুম্, বুবুম্-বুম্।

প্রতি মুহূর্ত্তটী সঙীন হয়ে উঠেছে।

সৈনিকেরা মাথার উপর তাকিয়ে আছে, কখন কোথা দিয়ে মাথার উপর বোমা এসে পড়ে। উপরে—গাছের ফাকে বোমা দেখলেই তারা এদিকে ওদিকে ছুটে পালাচ্ছে, সেই সময় অতর্কিতে কোথা থেকে আরেকটা বোমা পড়ে তাদের আহত করছে। আহতের আর্ত্ত চীৎকার বনভূমিকে ব্যথাতুর করে তুলছে। সে-আর্ত্তনাদ আকাশের উড়ন্ত প্লেনগুলিতে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে কি না, কে জানে! কিন্তু প্লেনগুলি ঘুরে ঘুরে আরো নীচে নেবে আসছে, আরো ঘন বোমা বর্ষণে বনকে করে ফেলছে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। অসহায় হাব্‌সী-সেনাদের আহত আর্ত্তনাদ সে ধোঁয়ার মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে। গাছের আশ্রিত

—হাত মাথার উপর তুলে ধর —২১৬ পৃষ্ঠা

পাখীগুলি ভয়ে তীক্ষ্ণ কর্কশ স্বরে চিৎকার করে উঠছে, ধূমেল্ বোমায়িত বনভূমির আব্ছায়ায় সে ডাক, প্রেতাত্মার অট্টহাসির মত শোনাচ্ছে।

আর্ত্তনাদ যত করুণ যত তীব্র হয়ে উঠে, বোমার বিস্ফোরণ যত বীভৎস, যত ভয়ঙ্কর হয়ে শোনা যায়, সরোজ ও ডেভিডের দেহের রক্ত ততই চনচন করে ওঠে। তারা পুরাণো সৈনিক! শত্রুর বোমার সামনে এমনি নিশ্চেষ্ট থাকার অভ্যাস তাদের নেই। মাথার মধ্যে কেমন যেন শিরশির করে ওঠে। সরোজ বলে—এমনিভাবে আর কতক্ষণ চুপ করে থাকবেন ক্যাপ্টেন? কামান চালাবার আদেশ করুন।

বাইনোকিউলারটী হাতে নিয়ে ক্যাপ্টেন এতক্ষণ একবার মাথার উপর আকাশের পানে, একবার দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তরের পানে তাকিয়ে জেলখানার সঙ্গীহীন সেলে আটকে-থাকা কয়েদীর মত ছট্ফট্ করছিলেন, কি করবেন যেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। সরোজের কথা শুনে হাসলেন, বললেন—আদেশ তো দোব, কিন্তু কামান চালাবে কে? প্লেন-মারা কামান চালাতে পারতো মাত্র দুজন, কাল তারা মারা গেছে। "দেসি"-তে খবর পাঠিয়েছি, কিন্তু এখনও তো সেখান থেকে লোক এসে পৌঁছালো না।

রবিদত্ত টিপ্পনি কাটলো—ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দ্দার! লোক দেখানো দুটো কামান রেখে ভেবেছিলেন বুঝি যে ইতালিয়ানরা ও দেখেই পালিয়ে যাবে।

রবিদত্তকে থামিয়ে দিয়ে সরোজ বললে—একথা আমাদের এতক্ষণ বলেননি কেন ক্যাপ্‌টেন্? একটা কামান আমাদের ছেড়ে দিন, আমরা একবার দেখি—

—আপনারা কামান চালাতে জানেন ?

—মহাযুদ্ধের সময় জার্মান লাইনের কত প্লেন আমাদের এক এক 'সেলে' মাটীতে আছড়ে পড়েছে।

—এতক্ষণ সেকথা আমায় বলতে হয়, আসুন এদিকে, বলে সরোজের একখানি হাত ধরে ক্যাপ্‌টেন এগিয়ে গেলেন। বোমাফাটার গোলযোগে আর ধূমের আঁধারের মধ্যে দিয়ে খানিকটা যাবার পর এক গাছের নীচে একটী প্লেনমারা কামান চোখে পড়লো। কামানটীকে ঘিরে কজন হাবসী সৈন্য বসে ছিল, ক্যাপ্‌টেনকে দেখে সব্ উঠে দাঁড়ালো। ক্যাপ্‌টেন ফরাসী ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন—কত সেল্ আছে ?

—প্রায় দুশো,—একজন সেনা উত্তর দিলে।

—তোমরা কজন এখানে আছ ?

—আটজন।

—কামান ঠিক আছে ?

—হাঁ।

—অল্‌রাইট্, আমার এ বন্ধু দুজন কামান চালাবে, তোমরা এদের সাহায্য কর, তারপর সরোজের পানে মুখ ফিরিয়ে বললেন—নিন্ আপনারা সুরু করুন।

সরোজ ও ডেভিড কামানের কাছে এগিয়ে গেল। নেড়ে-চেড়ে দেখলে ঠিক আছে কি না। তারপর রেঞ্জ ঠিক করে একটা গোলা চড়িয়ে ছুড়তে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একটা অঘটন ঘটে গেল। যে গাছটীর নীচে তারা দাঁড়িয়েছিল তার উপর একটী বোমা পড়ে সশব্দে ফেটে গেল। বোমার কয়েকটা টুক্‌রো ছট্‌কে এল নীচের দিকে, তার আঘাতে রবিদত্ত ও গাইড মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

গোলা আর ছোঁড়া হোল না; কামান রেখে সরোজ ও ডেভিড ছুটে এসে তাদের দুজনকে কোলে তুলে নিয়ে, একটু এগিয়ে ফাঁকা মাঠে এনে তাদের শুইয়ে দিলে। গাছের নীচে বনের ছায়া তখন আর মোটেই নিরাপদ নয়, ইতালিয়ানদের অবিশ্রান্ত আগুন-জ্বালানো বোমা অসংখ্য গাছে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। পুড়ে-মরার ভয়ে হাবসী সৈন্যেরা আহত সঙ্গীদের নিয়ে ফাঁকায় বেরিয়ে আসছে। চারিদিকে হৈ চৈ, অধৈর্য্য বিশৃঙ্খলা।

সরোজ ও ডেভিড, গাইড ও রবিদত্তের আঘাত পরীক্ষা করছিল, ক্যাপ্‌টেন পাশে এসে দাঁড়লেন, খানিকক্ষণ দেখে বললেন—আঘাত সামান্য বলেই মনে হচ্ছে, আমি এদের প্রাথমিক চিকিৎসা করছি, আপনারা কামান চালানগে, নাহলে আজকে একটা লোকও আর বাঁচবে না।

ইতিমধ্যে উপর থেকে এক ঝাঁক মেসিনগানের গোলা এসে

পড়লো। ইতালিয়ানরা এতক্ষণ সুযোগের প্রতীক্ষা করছিল। হাবসীরা বনের অন্তরাল থেকে ফাঁকা মাঠে আসায় সেই সুযোগ মিলে গেল। বোমা ছেড়ে তারা মেসিনগান ধরলে। ঝাঁকে ঝাঁকে মেসিনগানের গোলা নীচে নেবে আসতে লাগলো।

বাঁচার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যারা ফাঁকা মাঠে ছুটে এসেছিল, গোলার আঘাতে তারা রক্তাক্ত হয়ে লুটিয়ে পড়ছে দেখে সরোজের মাথার মধ্যে আগুন ধরে গেল। খৃষ্টান হয়ে যিশুর শান্তি, ক্ষমা ও প্রীতির নীতি না মেনে ইতালিয়ানরা যদি এমন নিষ্ঠুরভাবে মানুষ খুন করতে পারে, তাহলে খড়গধারী রক্ত-পাগল ছিন্নমস্তার উপাসকেরা এই অত্যাচার চুপ করে দেখে কি করে! তাড়াতাড়ি কামানের কাছে যাবার জন্য ফিরে দাঁড়াতেই দেখলে সৈনিকদের সাহায্যে কামান ও গোলাগুলি নিয়ে ডেভিড প্রায় পিছনে এসে পড়েছে। সরোজ ছুটে গেল, চিৎকার করে বললে—সেল চড়াও—

ডেভিড বললে—সেল তো দেওয়াই আছে।

—অলরাইট, বলে মাথার উপর সাতাশখানি 'প্লেনের দিকে দৃষ্টি রেখে সরোজ গোলা ছাড়লে—বুম্‌ম্‌!

শোঁ করে দুরন্ত সাইক্লোনের মত শিষ্‌ দিতে দিতে গোলাটা ছুটে গেল আকাশের পানে।

মাথার উপরে কাছাকাছি যে প্লেনখানি উড়ছিল, তাহার উপর দিয়ে আচম্বিতে একটা ঝড় বয়ে গেল। গোলার আঘাতে

একপাশের একখানি পাখা দেহচ্যুত হয়ে ছিটকে উপর দিকে উঠে গেল। একটা ডিগ্‌বাজী খেয়ে বোমারু প্লেনখানি কলছেঁড়া ঘুড়ির মত লট্‌পট করতে করতে নীচের দিকে নাবতে লাগলো। চারিপাশে হাবসীদের উল্লাস ধ্বনি শোনা গেল।

দেখতে দেখতে চালক সমেত প্লেনখানি চোখের সামনে ফাঁকা মাঠের উপর আছড়ে পড়ে চূর্ণ হয়ে গেল! হাবসীরা উল্লাসে আবার চীৎকার করে উঠলো।

প্রথম সাফল্যের আনন্দে ও উত্তেজনায় সরোজ ও ডেভিড উল্লাসিত হয়ে উঠলো। বন্ধু ও আত্মীয়, দেশ ও বিদেশ, সব তখন তাদের মন থেকে মুছে গেছে, অতীত ও ভবিষ্যৎ তখন তারা বিস্মৃত! বুকের মাঝে কাঁপছে যোদ্ধার মন, দেহে শত্রু-বিরোধী অদম্য সাহস, মনে হত্যাকারীর নিষ্ঠুর স্পর্দ্ধা। সত্য হয়ে ধরা দিয়েছে—গোলা, কামানের ট্রিকার, পাশের কমরেড্, মাথার উপরের শত্রু।

ডেভিড আরেকটা সেল চড়ালে; একখানি প্লেন লক্ষ্য করে কামানের মুখ ঘুরিয়ে সরোজ ট্রিকার টিপ্‌লে—শাঁ করে গোলাটা ছুটে গেল, বুম্ করে ফেটে পড়লো উড়ন্ত প্লেনখানির গায়ে। ঘূর্ণ্যমান প্রপেলারটা ঘুরতে ঘুরতে ছিট্‌কে গেল, সশব্দে মেশিনটা গেল ফেটে। অগ্নিশিখার লাল্‌চে আভা প্লেনটাকে গ্রাস করলে। চালক প্যারাচ্যুট নিয়ে লাফিয়ে পড়লো। তার নিম্নগতির বেগে প্যারাচ্যুটটা ফুলে বাতাসে ভেসে উঠলো।

পরমুহূর্ত্তেই নীচের অসংখ্য বন্দুকের গুলি প্যারাচুটটাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিলে। ফেঁসে-যাওয়া প্যারাচ্যুট লোকটীর ভার আর সইতে পারলে না, লোকটী মাটীতে আছড়ে পড়লো। প্রচণ্ড উল্লাসে হাবসীরা হর্ষধ্বনি করে উঠলো। ক্যাপটেন সরোজের পিঠ চাপড়ে বললে—ব্রেভো!

ডেভিড আবার সেল্ চড়ালো, সরোজ ট্রিকার টিপলে, কিন্তু এবার আর কোন প্লেন আহত হোল না। প্রতিদানে এক ঝাঁক গোলা এসে পড়লো সরোজের চারিপাশে। ধূলো ও ধোঁয়ায় চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেল, চোখে আর কিছুই দেখা গেল না, তথাপি সরোজের হাত থামলো না। মাথার উপর কিছু না দেখেই তারা কামান দাগাতে লাগালে।

ইতালিয়ান প্লেনগুলি ততক্ষণে সাবধান হয়ে গেছে, আত্মরক্ষা করার জন্য কামানের রেঞ্জের উপরে উঠে গেছে। এক একবার নীচের দিকে এক এক ঝাঁক গোলা ফেলছে বৃষ্টিধারার মত।

কতক্ষণ এই ভাবেই চললো। ঘড়ির কাঁটার হিসাবে সময় খুব অল্প হলেও, মৃত্যুর সংখ্যায়, আহতের আর্ত্তনাদে এবং সৈনিকদের ভয়, উত্তেজনা ও পরিশ্রমের পরিমাপে অনেক সময় বলতে হবে।

কোন এক সময় গোলাবৃষ্টি শেষ করে ইতালিয়ান প্লেনগুলি সরে পড়লো। ধীরে ধীরে ধূমেল অন্ধকার যখন কেটে গেল, হাবসীরা দেখলে আকাশ ফাঁকা। কিছুক্ষণ আগেও যে পঁচিশ-

খানি হত্যাকারী প্লেন মাথার উপর উড়ছিল, তখনকার আকাশ দেখে তা মনেও হয় না।

সন্ধ্যার আব্‌ছায়ায় ক্যাপ্‌টেন্‌ জন্‌সন্‌ সৈন্য সমাবেশ করলেন। হাজার পাঁচেক সৈন্যের মধ্যে তখনও হাজার তিনেক সুস্থ ছিল আর দুহাজারের মধ্যে শ'দুয়েক আহতকে মাত্র উদ্ধার করা গেল বাকী সেই দগ্ধমান জঙ্গলের মধ্যেই নিরুদ্দিষ্ট রয়ে গেল। সময় ছিল অল্প, ইতালিয়ানদের নাগালের বাইরে শীঘ্র সরে পড়া প্রয়োজন, অনুসন্ধানেরও অবসর পাওয়া গেল না।

ক'মিনিটের মধ্যেই ফাইল্‌ ঠিক হয়ে গেল। অজগর সাপের মত সৈন্যদলের দীর্ঘ লাইন। পদাতিক, অশ্বারোহী, মেসিন গান, প্লেন-মারা কামান, অশ্বতরের পিঠে জিনিষপত্র ও তাঁবুর সরঞ্জাম, এবং সবার শেষে অশ্বতরের পিঠে বাঁধা মাচার উপরে আহতরা।

অনিবার্য্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য একটী সৈন্য বাহিনী পালাচ্ছে। ইতালিয়ানদের গোলা ও বোমার মুখে তারা দাঁড়াতে পারছে না, ট্রেঞ্চ-কাটার কোন সুবিধাও হয়নি এখন পিছু না হটে উপায় কি। ক্যাপ্‌টেন্‌ জন্‌সন বুঝেছেন ইতালিয়ানদের ঠেকিয়ে রাখতে হলে সমতল প্রান্তরের মাঝে মুখোমুখি দাঁড়ালে চলবে না, বন্ধুর পাহাড়ে পাহাড়ে সৈন্য সমাবেশ করতে হবে, সুযোগ পেলেই আড়াল-আবডাল থেকে চালাতে হবে গরিলা যুদ্ধ। সেইজন্যই 'দেসির' পাহাড়ী অঞ্চলে তিনি সৈন্য পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

সৈন্যবাহিনী এগিয়ে চলেছে ।—

সেই রাত্রির মার্চ্চ সত্যই স্মরণীয়। সামনে ও পিছনে দিগ্বলয়ের বাঁকা রেখা আব্‌ছা হয়ে গেছে। উন্মুক্ত প্রান্তরের বুকে মাটীর ঢেউ উঠছে নামছে, সামনের প্রান্তরকে পৌঁছে দিয়েছে একেবারে আকাশের গায়ে। চাঁদের আলোয় পিছনে গাছপালাগুলো দৈত্যের মত রহস্যময় হয়ে উঠেছে। পিছনে দগ্ধমান বনের ধোঁয়ার পানে তাকিয়ে মনে হয়, মৃত্যু-দেবতার পূজার আগে কে যেন প্রকাণ্ড একটা ধূনী জ্বালিয়ে দিয়েছে। এখানে সেখানে ছোট ছোট অসংখ্য বন্য আগাছার ঝোপ চোখে পড়ে, পথের পাশে যেন এক একটী হিংস্র জানোয়ার শীকারের প্রতীক্ষায় ওঁৎ পেতে বসে আছে। সেগুলিকে পাশ কাটিয়ে এঁকে বেঁকে পথহীন প্রান্তরের বুক চিরে সৈন্যদল মার্চ্চ করে চলে।

চলতে চলতে বনানীর গাছের রেখা পিছনে অস্পষ্ট হয়ে কখন আকাশের গায়ে মিলিয়ে যায়। মাঝে মাঝে দম্‌কা হাওয়ার এক একটী ঝাপ্‌টা স্নেহের পরশ দিয়ে তাঁদের শ্রান্তি মুছে নেবার চেষ্টা করে। আকাশে পেঁজা-পেঁজা তূলোর মত মেঘগুলির পানে তাকিয়ে সেই সীমাহীন তেপান্তরের অন্ধকারে সৈন্যদের বড় একা-একা মনে হয়। মৃত্যুর মত করুণ বিষণ্ণতা সবাকার মনকে আচ্ছন্ন করে তোলে। শত শত নির্ব্বাক সেনা সমতালে পা ফেলে এগিয়ে চলে, মন পড়ে থাকে ফেলে-আসা

কোন সুদূরের এক কুঁড়ে ঘরে। মা-বাপ ভাই-বোন বউ-ছেলের মুখগুলি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ভাবে : আর হয়তো সেই সব আপনজনদের কাছে ফিরে যাওয়া হবে না। ইতালীয়ানদের এই মৃত্যুযজ্ঞে হত্যাকারী নিষ্ঠুর বিষ-গ্যাস কি বোমা মরণের অন্ধকারে তাদের অবলুপ্ত করে দেবে—মেরে তারা ফেলবেই! শান্তিতে পৃথিবীর এক কোণে পাহাড়ের গায়ে, জঙ্গলের পাশে, কি নদীর ধারে একটুকরো জমিতে ছোট একখানি কুঁড়ে ঘর বেঁধে বাস করার সুবিধা আরেক দেশের মানুষ তাদের দেবে না। এক দলের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে আরেকদল বড় হবে, ইহাই নাকি সভ্যতা! বেদের যুগ থেকে পাঁচ হাজার বছরের মানব-ইতিহাস এই দস্যুতারই ক্রমোন্নতি লিপিবদ্ধ করে গেছে। ইতালিয়ানদের এই আবিসিনিয়া-অভিযানও সেই সভ্যতারই সবচেয়ে আধুনিকতম কাহিনী। বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য এই দুর্দ্দান্ত সভ্যতা থেকে মানুষকে মুক্ত করতে পারেননি, তাঁদের বাণী মানুষ শুনছে—কিন্তু অন্তরে গ্রহণ করেনি।'

সরোজ ভাবে আর ভাবে, মাথার মধ্যে চিন্তায় ঝড় বয়ে যায়।

অজগর বাহিনীর পিছনে তারা চলেছে। সামনে দুটা প্লেন-ধ্বংসী কামান, পিছনে অশ্বতরের পিঠে দুটী আহত সঙ্গী, পাশে চলমান বন্ধু, মাথার উপর মসৃণ নীল আকাশ, নীচে ঢেউখেলানো

সীমাহীন ধূসর প্রান্তর, চারিপাশে চাঁদের আলোয় ঘেরা স্তিমিত বিবর্ণ অন্ধকার রাত্রি, পায়ের নীচে শুধু পথহীন চলার পথ।

সরোজের মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো বিনয়বাবু ও ডাক্তার রায়ের জন্য। এই দুর্য্যোগের দিনে আবিসিনিয়ার দুর্গম অরণ্য, বন্ধুর পাহাড় ও সন্ত্রস্ত জনপদের মধ্যে কোথায় তারা হারিয়ে গেছে, আর কোনদিনই তাদের সঙ্গে দেখা হবে না; হয়তো সেই দুর্দ্দান্ত কাপালিকের কবল থেকে আর তাদের উদ্ধার করা যাবে না!

দুশ্চিন্তায় সরোজের মন উন্মনা উদাস হয়ে গেছে, মন-হীন মেশিনের মত এগিয়ে চলেছে।

কোন এক সময় ক্যাপ্টেন জন্সনের ঘোড়া সরোজদের পাশে পাশে চলতে সুরু করেছে। সহসা স্তব্ধতা ভেঙ্গে চিন্তাতুর সরোজকে চমকে দিয়ে ক্যাপ্টেন বলে উঠলেন—দেখুন, সরোজবাবু, আপনারা দুজনে আমাদের একটা প্লেন-ধ্বংসী কামান চালাবার ভার নিন্, আমার তিনহাজার সৈন্যের মধ্যে একজনও নেই যে ওই কামান ধরতে জানে, আপনাদের এই ভারটা নিতে হবে।

সরোজ বললে—কিন্তু জানেন তো আমরা দুটী হারাণো বন্ধুকে খুঁজতে বেরিয়েছি, তাদের না পেলে······

—দেখুন,—বাধা দিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন—যেভাবে ইতালিয়ানরা বোমা ফেলছে, তাতে বন্ধুদের হয়তো কোনদিনই

আর খুঁজে পাবেন না, তার উপর এই যুদ্ধক্ষেত্রে সন্ধান করাও সম্ভব নয়।

—তা জানি,—সরোজ বললে,—কিন্তু সেকথা ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে তো চুপ করে বসে থাকতে পারি না।

ডেভিড বললে—তাছাড়া আমরা তো এখানে কামান চালাতে আসিনি।

—আমিও কি এখানে 'অফিসার' হয়ে এসেছিলুম, জন্‌সন্ বললেন—কিন্তু যখন দেখলুম আমার সামনে নিরীহ শিশু ও মহিলারা নিষ্ঠুরভাবে নিহত হচ্ছে, তখন পুরাণো সৈনিক হয়ে চুপ করে দেখি কেমন করে বলুন তো? হোক্ না ওরা কালা আদ্‌মি, তাবলে কি ওরা মানুষ নয়, ভগবান যিশুও তো কালা আদ্‌মিই ছিলেন!

তথাপি সরোজ যখন আপত্তি তুলে বললে—কিন্তু—

জন্‌সন বললেন—কিন্তুর কিছু নেই। বন্ধুদের খুঁজতে খুঁজতে যদি আবার আপনারা ইতালিয়ানদের হাতে পড়েন তাহলে তখুনি কোর্টমার্শাল হয়ে যাবে। তাছাড়া উপস্থিত আপনাদের যে দুজন সঙ্গী বোমার আঘাতে আহত হোল তাদের প্রতি তো আপনাদের কর্ত্তব্য আছে, আপনারা তার শোধ নেবেন না?

ডেভিড বললে—ইতালিয়ানদের সঙ্গে আমাদের তো কোন শত্রুতা নেই!

জন্‌সন্ বললেন—বন্ধুত্বই বা কি আছে? শান্তিপূর্ণ শহরের নিরীহ মানুষদের যারা নিষ্ঠুরভাবে বোমা মেরে হত্যা করতে পারে, তারা জগতের শত্রু,—তাদের সঙ্গে কোনো দেশের, কোনো জাতির, কোনো মানুষেরই বন্ধুত্ব থাকতে পারে না, থাকা উচিৎও নয়। আজ তারা এখানে যে হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে, কাল তারা আরেক দেশে তার পুনরাবৃত্তি করবে!—তাদের বাধা দিতে হবে! এই অসংখ্য শান্তিপ্রিয় নিরীহ নরনারী ও শিশুকে কেন তারা খুন করবে?—আপনারা হাতে শক্তি আছে, আপনি তাদের বাধা দিন। আপনারা হিন্দু, শুনেছি—দরিদ্র জনগণই আপনাদের ভগবান, দুর্গতসেবাই আপনাদের ধর্ম্ম, আপনারা স্বধর্ম্ম পালন করুন!

সরোজ কোন কথা বললে না।

জন্‌সন তার হাতে একটী ঝাঁকানি দিয়ে বললেন—কথা বলছেন না কেন? আমি মিথ্যা কিছু বলেছি?

সরোজ বললে—বেশ, তবে তাই হোক!

সকাল হোল। পূর্ব্বদিকের আকাশে উষার আলো নানান্ রঙে ছড়িয়ে পড়ছে। আকাশের একটা প্রান্ত রঙে রঙীন্ হয়ে উঠছে। সেই রঙের রেশ আকাশের বুক থেকে পাহাড়ের মাথায় গাছের সবুজ পাতায় ধূসর প্রান্তরে ও সেনাবাসের শাদা তাঁবুর গায়ে নেবে এল। ঝির-ঝিরে বাতাসে, রঙীন পাখীর

ডাকে, ভোরের আনন্দ যখন ছড়িয়ে পড়লো, সেই সময় সরোজরা দেসিতে এসে পৌঁছলো।

সুইডিশ্ জেনারেল এরিক্ ভার্জিন বেলজিয়ান্ ক্যাপ্টেন মোজারিক জন্সনকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন, সরোজদেরও আদর আপ্যায়নের ত্রুটি হোল না, বরং বিদেশী বলে তারা যেন একটু বেশী আদর যত্ন পেলে। ক'দিন পরে আজ আহারাদিও ভাল হোল, প্রচুর দুধ, রুটি, মাখন। 'মধু-মাখনের দেশ' বলে আবিসিনিয়ার যে খ্যাতি এতদিন শোনা গেছিল, আজকের আহার্য্য থেকেই তা বেশ বোঝা গেল।

আহারাদির পর সরোজরা বেরিয়ে পড়লো হাসপাতালে বন্ধুদের দেখতে।

সৈন্যদের ছাউনি থেকে পোয়াটাক পথ গেলেই হাসপাতাল, তারপর সুরু হয়েছে সহর।

হাসপাতালের ফটকে বড় বড় অক্ষরে নাম লেখা আছে—তাকারী ম্যাকোনেন হাসপাতাল। ভিতরে ঢুকে চোখে না দেখলে আবিসিনিয়ার কোন সহরে এমন একটী হাসপাতাল যে থাকতে পারে এ যেন সহজে বিশ্বাস করতে মন চায় না। আবিসিনিয়ার অসভ্য কালা-আদমিদের যে তথ্য এতদিন য়ুরোপের লোকেরা কাগজে ছেপে প্রচার করেছে, সে-সব যারা পড়েছে তাদের কাছে এমন হাসপাতাল যেন স্বপ্নকথা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন

দুসারি বিছানা, ওষুধ-পত্র, নার্স-ডাক্তার—কিছুরই অভাব নেই। চারিপাশে একটী মার্জ্জিত শিষ্টতা ও শালীনতার আভাস।

সব ক'জন ডাক্তারই সাহেব,—সুইডিশ,—আইরিশ, ফরাসী, ইংরাজ ও জার্ম্মাণ। য়ুরোপের বিভিন্নজাতির রেড্‌ক্রশ সমিতির যে সব ডাক্তার মানুষের সেবা করাই বড় ধর্ম্ম বলে মনে করেছে তারাই এখানে ছুটে এসেছে আহত নরনারীর সেবা করার জন্য। একদল লোকের কাছে মাটীর চেয়ে মানুষের দাম কম, মাটীর লোভে বোমা ও কামানের আঘাতে তারা সুস্থ ও সবল মানুষগুলোকে হত্যা করে চলেছে, আরেকদল তাদের প্রাণ রক্ষা করার জন্য, আহত দেহগুলোকে কার্য্যক্ষম করে তোলার জন্য আপ্রাণ সাধনা করছে। পশু-শ্রেষ্ঠ মানুষের সামাজিক নিয়ম-কানুন ভারী চমৎকার!

একটী লোক খুন হলে হত্যাকারীর ফাঁসী হবে, কিন্তু যখন দলে দলে মানুষ নিহত হবে, একটা জাতি উজাড় হয়ে যাবে, তখন সেই হত্যাকরী-দলের নায়ক হবে দিগ্বিজয়ী বীর—আলেকজাণ্ডার, জুলিয়াস-সিজার, তৈমুরলঙ্ অথবা নেপোলিয়ন, নিহত ও পরাজিতদের সব সম্পত্তি তখন তারা রাজার হালে উপভোগ করবে, তারা যে তখন বিজয়ী!

হাসপাতালে সব বেড্‌ই ভর্ত্তি, আহত সৈনিকের জন্য হাসপাতালের মেঝেতে পর্য্যন্ত বিছানা করতে হয়েছে। অস্পষ্ট গোঙানি ও কাৎরাণি বাতাসকে ভারী করে তুলেছে।

নার্সকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে, নার্স একদিকের দুটো বেড্ দেখিয়ে দিলেঃ রবিদত্ত ও গাইড পাশাপাশি শুয়ে আছে, হাতে ও মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

সরোজ উদ্বিগ্নভাবে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করতে ডাক্তার বললেন—দুর্ভাবনার কিছুই নেই, হাতে ও মাথায় সামান্য চোট লেগেছে, সাত আট দিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠবে। এখন ঘুমোচ্ছে, ডাকবেন না।

সরোজরা হাসপাতাল থেকে নিশ্চিন্ত মনে ফিরলো।

সারা রাত জেগে দীর্ঘ পথ চলার পরিশ্রমে দুপুরের ঘুমটা একটু গাঢ় হবারই কথা, কিন্তু সহসা নির্দ্দয় বিউগিলের কর্কশ ধ্বনি সে সুনিদ্রা ভেঙ্গে দিলে। চোখ মেলেই সরোজ দেখে চারিদিকে সাড়া পড়ে গেছে, কামান সাজানো হচ্ছে, একদিকে যে খানিকটা ট্রেঞ্চ ঢাকা হয়েছে সেখানে পদাতিক সৈন্যের দল নিজ নিজ স্থান দখল করতে ব্যস্ত, বাকী সৈন্য ছাউনির পিছনে, সহরের ঘড়বাড়ীর আড়ালে সরে যাচ্ছে। যারা এখনও সহরে ছিল তারা এদিকে-ওদিকে ছুটোছুটি করছে! চারিদিকে একটা গোলমাল, চেঁচামেচি, হৈ-চৈ।

বায়োস্কোপের ছবির পানে লোকে যেমন কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে থাকে, সরোজ তেমনি অভিভূত হয়ে তাকিয়েছিল, এমন সময় ক্যাপ্টেন জন্সনের ঝাঁকানি তার চমক ভাঙল—কৈ মিস্টার সরোজ চলুন—

—কোথায় ?

—কামান চালাতে, ইতালিয়ান প্লেন আসছে।

—সত্যি ?

—আপনি কি জেগে ঘুমোচ্ছেন নাকি, বলে জনসন সরোজকে দেখিয়ে দিলে—ওই দেখুন পূব্‌দিকে,-ওই একঝাঁক চিলের মত এদিকে আসছে—দেখছেন ?

সরোজের আচমকা-ঘুম-ভাঙা আচ্ছন্নভাবটা ততক্ষণে কেটে গেছে, একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—অলরাইট্‌, আমি প্রস্তুত !

ক্যাপ্‌টেন ডাকলেন—মিষ্টার ডেভিড !

—yes I am ready !

ক্যাপ্‌টেনের সঙ্গে দুই বন্ধু মার্চ্চ করে এগিয়ে গেল। কাছেই একটী প্লেনধ্বংসী কামান ছিল। কামানের মুখ ফিরিয়ে প্লেনগুলির আগমন প্রতীক্ষায় সরোজ ও ডেভিড অপেক্ষা করতে লাগলো।

কতক্ষণ মনে হোল প্লেনগুলো যেন আর এগিয়ে আসছে না, তাদের প্রপেলারের গর্জ্জন কাণে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে না, তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় যেন বহমান সময় স্থির স্তব্ধ হয়ে গেছে, গতিশীল মুহূর্ত্তগুলি গতি হারিয়ে ফেলেছে ! না হলে সময় এগিয়ে চললে প্লেনগুলোতো এগিয়ে আসবে।

প্রতীক্ষমান চোখের তারায় এরোপ্লেনের গতি শেষে সত্যই

প্রতিফলিত হোল, দেখা গেল ঃ প্লেনগুলি ধীরে ধীরে পূর্ব্বদিকে দিগ্বলয় থেকে উদয় হয়ে উত্তরের আকাশে অস্ত গেল। আবার তাদের দেখা দেবার প্রত্যাশায় সৈন্যরা কতক্ষণ নিশ্চল উন্মুখ হয়ে রইল, কিন্তু আর তারা উদয় হোল না।

ডেভিড বললে—ওগুলো অবজারভেশন্ প্লেন, আক্রমণের আগে চারিদিকের অবস্থাটা একবার দেখে নিচ্ছে!

সরোজ বললে—আমারও তাই বলে মনে হয়!

সরোজের ও ডেভিডের চোখ থেকে তখনও ঘুম ছাড়ে নি, বসে থেকে থেকে তারা সেই খানেই শুয়ে পড়লো।

কালবৈশাখীর ঝড়ো রাতে অন্ধকারের বুকে বিদ্যুতের চক্‌মকি জ্বালিয়ে বজ্রপাত লোককে যেমন সচকিত করে, সেদিন রাত্রির অন্ধকারে অসংখ্য বোমার বিস্ফোরণ ও সন্ধানী আলোর তীব্র ঝল্‌মলানি তন্দ্রাচ্ছন্ন হাবসী সেনাদের তেম্‌নি চমকে দিলে। চোখ থেকে ঘুম ছাড়ার আগেই বিউগিলের তীব্র ধ্বনি কানকে আহত করলে—ভপো, ভপো, পোঁ—প্রস্তুত হও সৈন্যদল,··· শত্রু···!

ঘুম থেকে উঠেই ভয়ব্যাকুল সৈন্যের জনতা আত্মরক্ষার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলো।

মাথার উপর ইতালিয়ান প্লেন থেকে বড় বড় সার্চ্চ লাইটের জোরালো আলো হাবসী সেনাদের ছাউনির এপাশ থেকে ওপাশ

পর্য্যন্ত বারবার ঝল্‌সে দিতে লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে অজস্র বোমা আর সেল্‌ ফাটার শব্দ···আলোর দীপ্তি···মাটীর কাঁপন···সৈন্যদের গোলযোগ··· আহতের আর্ত্তনাদ···

কে কোথায় পড়লো, কে মরলো, কেউ সেদিকে তাকায় না। সাগরের জলরাশি তটের আঘাতে যেমন অবিরাম গর্জ্জন করে, বোমা ও সেলগুলি মাটির আঘাতে তেমনি চারিপাশে ফেটে পড়ছে। বোমা পড়ার বিরাম নেই, শুধু একটানা বাতাস কাঁপানো বুমম্‌ বুম্‌ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায়না, অন্ধকারে অজস্র ধোঁয়া আর ধূলো চারিদিক আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ধোঁয়ায় চোখ জ্বলছে, সাল্‌ফারের গন্ধে নিঃশ্বাস হয়ে আসছে রুদ্ধ।

সহসা পাশ থেকে কার চীৎকার সরোজের কানে এসে লাগ্‌লো—ওয়াটার—ওয়াটার, ওঃ !

মরণোন্মুখ আহত মানুষের একবিন্দু জলের পিপাসা !

আহত বিদেশীকে দেখবার জন্য সরোজ মুখ ফেরালো, কিন্তু ধূলো ও ধোঁয়ার মাঝে কিছুই নজরে পড়লো না। কাছে আর একটী বোমা পড়ে সেই আর্ত্তনাদ চাপা দিয়ে দিলে। তবু সেই কথার সুরটা সরোজের কাণে যেন বাজতে লাগলো, তার সারা দেহের সব স্নায়ুগুলোকে যেন একটা ঝাঁকানি দিয়ে চঞ্চল করে তুললো। প্লেন-ধ্বংসী কামানের পাশেই সে শুয়েছিল, এক লহমায় উঠে দাঁড়ালো, ডাকলো—ডেভিড ! ডেভিড !!

—ইয়েস !

—সেল !

—ইয়েস—

ডেভিড সেল্ চড়িয়ে দিলে, সরোজের হাতের কামান মাথার উপর অন্ধকার আকাশের পানে গর্জ্জন করে উঠলো, অনির্দ্দিষ্ট অন্ধকারে জ্বলন্ত গোলাটা শন্ শন্ করে ছুটতে ছুটতে কোথায় কতদূরে গিয়ে হারিয়ে গেল।

ডেভিড আবার সেল চড়ালে, উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠলো—Cheerio, old boy, life for life !

কামান চালাতে চালাতে মুখ না ফিরিয়েই সরোজ প্রতিধ্বনি তুললে—life for life !

রীতিমত যুদ্ধ। মহা মৃত্যু-কাণ্ড। কখন নীচের কামান শিষ দিচ্ছে, কখন উপর থেকে বোমা ফাটছে, কিছু বোঝার উপায় নেই—শুধু শোঁ-শোঁ, বুম্-বুমের গোলযোগ।

শুধু দৃষ্টি-বিরোধী ধোঁয়া আর ধূলো—

কেবল নিঃশ্বাস-রোধী সালফারের গন্ধ—

অবিরাম আহতের অন্তিম মুহূর্ত্তের শেষ তীব্র চিৎকার—

মৃত্যু আর মৃত্যু। যুদ্ধের নামে অসংখ্য মানুষের নির্ম্মম হত্যাকাণ্ড। একদল মানুষকে নিঃশেষ করার জন্য আরেকদলের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যাকে কোনও দিন চোখে দেখে নি, যার সঙ্গে বিবাদ হওয়া তো দূরের কথা, মুখের একটা কথা পর্য্যন্ত হয়নি, তাকেই হত্যা করার জন্য পরস্পর দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। যে মানুষ জ্ঞানের উন্নতির জন্য, পরস্পরকে সুখী করার জন্য, সুবিধা দেবার জন্য, বাঁচিয়ে রাখার জন্য যুগযুগান্তর ধরে সাধনা করে আসছে, সেই মানুষেরই এ আরেক রূপ। এই রণোন্মত্ত হিংস্র মানুষগুলি হায়নার চেয়েও রক্তলোলুপ, সাপের চেয়েও বিষাক্ত। এদের পানে তাকালে বুদ্ধ, যিশু, চৈতন্য ও গান্ধী যে এদেরই মাঝে জন্মেছে, এডিসন, নিউটন, মার্কণি ও জগদীশ-চন্দ্র যে এদেরই একজন, অশোক, বিবেকানন্দ দেশবন্ধু ও অরবিন্দ যে এদের জন্যই সর্ব্বত্যাগী, সে-কথা আর ভাবা যায় না, শুধু মনে পড়ে শিয়ালের শঠতা, হায়নার হিংস্রতা, ঈগলের দৃষ্টিভঙ্গী, অক্‌টোপাশের বীভৎসতা—সব মিশিয়ে এক নিষ্ঠুর

ভয়াল রূপ। যুদ্ধরত সভ্য মানুষের ভীষণতা বন্যপশুর পাশবিকতাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

যুদ্ধ চলেছে······

কতক্ষণ পরে বোমাবর্ষণ কমেছে বলে মনে হোল। বিস্ফোরণের ধোঁয়াও যেন পাতলা হয়ে এল। আগে সার্চ্চ-লাইটের আলো ভালো দেখাই যাচ্ছিল না। এবার তার দীপ্তি মাঝে মাঝে চোখকে ঝল্‌সে দিচ্ছে। তীরের মত আলোর রশ্মি ঘুরে বেড়াচ্ছে গাছের মাথায়, মাঠের বুকে, দূরে সহরের ঘর বাড়ীর গায়ে।

সহসা সরোজের কানে এসে লাগলো—আগুন! আগুন!! হাসপাতালে আগুন লেগেছে, স্বরটা আয়েষার।

সরোজ চমকে উঠলো, বললে—হাসপাতালে আগুন?

আয়েষা বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ। ইতালিয়ানরা হাসপাতালের উপর বোমা ফেলেছে, আর্টিস্ট আর গাইড্ অতক্ষণে······

—বুম?

—বুম্‌ম্!!

—বুম্‌ম্—বুম্!!!

আয়েষার বাকী কথাগুলো বোমার শব্দে শোনা গেল না। সরোজের মনের পর্দ্দায় ভেসে উঠলো একখানি ছবি; চারিপাশে আগুনে অচেতন ও অর্দ্ধ চেতন আহত লোকগুলি

জীবন্ত দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। সরোজ চিৎকার করে বলে উঠলো—ডেভিড!

—ডেভিড উত্তর দিলে—রেডি—

Come along,—বলে ডেভিডের একখানি হাত এক হাতে চেপে ধরে, আরেক হাতে আয়েষার একখানি হাত ধরে উত্তেজিত সরোজ হাসপাতালের দিকে ছুটলো।

রণভূমি। বোমার বিস্ফোরণে, মাটীর উৎক্ষেপণে, ধূমের আবরণে দুর্গম ভয়াল হয়ে উঠেছে। এখানে সেখানে মৃত-দেহ ছড়ানো। আহত দেহের উপরেই কখন-কখন পা পড়ে যাচ্ছে, মুমূর্ষুরা সে পদাঘাত সইতে পারছে না, করুণ ভয়ার্ত্ত আর্ত্তনাদ করে উঠছে। সরোজের সেদিকে লক্ষ্যই নেই, লক্ষ্য করার মত অবসরও নেই, সঙ্গীদের হাত ধ'রে সে ছুটে চলেছে। সামনে যা-কিছু পড়ছে পায়ে দলে চলে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে বাধা পাচ্ছে, দু-একবার পা পিছলেও পড়ছে, আবার উঠে ছুটছে—দুটী আহত সঙ্গীর জীবন এখন তাদের গতির উপর নির্ভর করছে। তারা ছুটছে—

হাসপাতালের দরজায় যখন তারা এসে পৌঁছুল, হাসপাতাল তখন আর আরোগ্যশালা নেই, হয়েছে অগ্নিশালা। ইতালিয়ান প্লেন থেকে আগুন-জ্বালানো বোমা ফেলে হাসপাতালে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালের মাথায় লাল ক্রুশ-আঁকা

বড় বড় নিশানগুলি বোমার বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন। একদিকে জ্বলে উঠেছে লেলিহান অগ্নিশিখা। বহু সাধনায় বহু চেষ্টায় যা একদিন গড়ে উঠেছিল, অবহেলায় মানুষ তাকেই আজ ধ্বংস করে দিচ্ছে। সজ্জনেরা যা একদিন আর্ত্তদের আরোগ্যশালা করেছিল, দুর্জ্জনেরা আজ তা' আহতদের দগ্ধশালা করে তুললে।

আগুনের দীপ্তিতে চারিদিক আলোকিত।

শত্রুর বোমাকে তুচ্ছ করে, মৃত্যুর আতঙ্ককে উপেক্ষা করে হাসপাতালের দরজার কাছে অসংখ্য লোক জমে গেছে। যাদের আপনার জন আহত হয়ে হাসপাতালে পড়ে আছে তারা ছুটে এসেছে। বাহিরে তাদের হা-হুতাশ, ভিতরে আতঙ্কিত আহতের করুণ আর্ত্তনাদ, চোখের সামনে আগুনের দাপাদাপি, মাথার উপরে বোমার বিস্ফোরণ স্থানটীকে প্রলয়ঙ্কর করে তুলেছে। সেই দুষ্প্রবেশ্য জনসমুদ্রের মধ্য দিয়ে মাথা ঠিক রেখে এগিয়ে যাওয়া বড়ই কঠিন।

কিন্তু সরোজের এগুতেই হবে—

কারুর পানে সরোজ তাকালো না, নর-নারী বিচার করলো না, ভীড়ের মাঝে দুপাশে কনুইয়ের ধাক্কা দিয়ে পথ করে নিয়ে এগুলো।

আয়েষা ও ডেভিডকে নিয়ে হাসপাতালের ভিতরে প্রবেশ করে সরোজ দেখে, বাহিরের চেয়ে ভিতরে ভীড় কম নয়।

চলার পথটা লোকে ভর্ত্তি হয়ে গেছে। ডাক্তার নার্সের দল ছুটোছুটি করছে। আহতদের বাহিরে সরিয়ে আনার চেষ্টা হচ্ছে কিন্তু উৎসুক জনতার ভীড়ে বারবার তারা বাধা পাচ্ছে, ক্ষিপ্রভাবে কাজ করতে পারছে না। এদিকে লেলিহান অগ্নি-শিখা সমগ্র হাসপাতালকে গ্রাস করতে উৎসুক। যে ভাবে কাজ চলছে তাতে বেশী আহতকেই পুড়ে মরতে হবে।

হাসপাতালের ভিতরে ঢুকে সরোজের গোলমাল হয়ে গেল। কোনদিকে রবিদত্ত ও গাইড আছে তা সে মনে করতে পারলো না, খানিকটা এগিয়ে ভীড়ের মাঝে থমকে দাঁড়ালো।

আয়েষা বোধহয় তার মনের কথাটি বুঝতে পেরেছিল, জামা ধরে টানলে—বললে—ওদিকে নয় এদিকে—

সরোজ ফিরলো।

আয়েষা তাদের যেদিকে নিয়ে গেল, আগুনটা সেই দিকেই তীব্র হয়ে উঠছে। ওয়ার্ডের একদিক দাউ দাউ করে জ্বলছে। আহতদের চিৎকারে, সুস্থ মানুষের কোলাহলে, নার্স ও ডাক্তারদের ছুটোছুটিতে সে-দিকটায় এমন একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে যে কে কোথায় যাবে, কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারছে না। তার মধ্যে আয়েষা যে কি করে এক ধারে দুটী বেডের কাছে নিয়ে গেল, সে এক অসাধ্য ঘটনা।

দুটী বেডে রবিদত্ত ও গাইড পড়েছিল, আগুন তখনও তাদের কাছে এগিয়ে আসার সুবিধা পায়নি। সরোজ তাদের

দেখেই চিনলে, তাড়াতাড়ি রবিদত্তকে কাঁধে তুলে নিলে, তারপর চিৎকার করে ডাকলে—ডেভিড !

ডেভিড পিছনেই ছিল, 'ইয়েস্'—বলে এগিয়ে এসে পাশের বেড থেকে গাইডকে কাঁধের উপর তুলে নিলে।

সামনে ওয়ার্ডের শেষ প্রান্তে দুটী বড় বড় জ্বলন্ত কাঠের কড়ি তখন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো। যারা তার নীচে ছিল তাদের জ্বলন্ত সমাধি হয়ে গেল। ভীড়ের মধ্যে হৈচৈ পড়ে গেল। বাহিরে যারা ছিল, তারাও তখন হাসপাতালের সেই ঘরখানির ভিতরে এসে ঢুকতে চায়। তাদের মধ্যে দিয়ে পথ করে বাহিরে বেরিয়ে আসার জন্য সরোজ ও ডেভিড প্রাণপণে ধাক্কাধাক্কি করতে লাগলো—

হাসপাতালের বাহিরে এসে ভীড় পার হয়ে যখন তারা ফাঁকায় এসে দাঁড়ালো, তখন তাদের মনে হোল বোমা বর্ষণের চেয়েও একটা ঘোরতর দুর্য্যোগ, একটা বড় ঝড় তারা কাটিয়ে এসেছে। জ্বলন্ত হাসপাতালের অগ্নিকুণ্ড থেকে দুটো বন্ধুকে তারা যে উদ্ধার করতে পেরেছে এই তাদের গৌরব, ওই তাদের আনন্দ।

বাইরে এসে কিন্তু তারা দিক্-ভ্রান্ত হয়ে গেল—কোন্ দিকে যাবে ? কোথায় যাবে ? চারিদিকেই শুধু বুম্ বুম্ করে বোমা ফাটছে। সার্চ্চ লাইটের তীব্র আলো ঘুরছে এদিক থেকে ওদিক পর্য্যন্ত। অপঘাত মৃত্যু নীল আকাশের মত সমগ্র

প্রান্তরটাকে যেন ঢেকে ফেলেছে। এই মৃত্যুময় প্রান্তরের আড়ালে এখন একটু নিরাপদ আশ্রয় চাই।

ধূসর গন্ধকের ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে যতটা সম্ভব এদিক ওদিক তাকিয়ে সরোজরা একটা দিক ঠিক করে এগুবার উদ্যোগ করছে এমন সময় কোথা থেকে একটী মহিলা ছুটে এসে তাদের সামনে দাঁড়ালো, সরোজের জামা ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললে—হাসপাতাল্‌সে আতে হো বাবুজী?

বিদেশের যুদ্ধক্ষেত্রে এক মহিলার মুখে হিন্দি কথা শুনে সরোজ থমকে দাঁড়ালো। মহিলাটী ততক্ষণে উত্তরের অপেক্ষা না রেখে সরোজকে নতুন কথা জিজ্ঞেস করলে—মেরে বাচ্চাকো দেখা বাবুজী,—মেরি লেড়কা? আর্জ সাত-রোজ উস্‌কো চোট্‌ লাগা…

কথা বলতে বলতে সরোজ ও ডেভিডের কাঁধের পানে তাকিয়ে মহিলাটীর কি যেন মনে হোল, বলে উঠলো—ইয়ে কি মেরি লেড়কা বাবুজী—মেরি লেড়কা?

এই বলে তাড়াতাড়ি সরোজ ও ডেভিডের পিছনে গিয়ে আহত রবিদত্ত ও গাইডের মুখ দুখানি তুলে ধরে জ্বলন্ত হাসপাতালের অগ্নিশিখার আভায় একবার দেখে নিলে, তারপর নিরাশ হয়ে আয়েষার মুখের পানে তাকিয়ে বললে—দেখা বেটী,—মেরি লেড়কেকো দেখা?

মায়ের সেই ব্যাকুল জিজ্ঞাসার উত্তরে এধারে ওধারে কয়েকটী বোমা ফেটে পড়লো শুধু—বুম্‌-বুম্‌-বুম্‌ম্‌!

ফাঁকা-মাঠের বুকে নিজেদের অবস্থাটা উপলব্ধি করে সরোজ চঞ্চল হয়ে উঠলো। এমন সময় কোথা থেকে ক্যাপ্‌টেন জন্‌সন্‌ এসে উপস্থিত, বললেন—আমি তোমাদের খুঁজছি, তোমরা কামান ছেড়ে পালিয়ে ছিলে কোথা বল ত?

—পালাই নি ক্যাপ্‌টেন্‌, হাসপাতালে গেছিলুম এই দুটী বন্ধুকে নিয়ে আসবার জন্যে—

—বেশ করেছ মিষ্টার, এখন চল কামান চালাতে হবে—

—আগে একটু নিরাপদ আশ্রয় চাই ক্যাপ্‌টেন্‌, এই অসুস্থ বন্ধু দুটীকে···

হাহা করে ক্যাপ্‌টেন হেসে উঠলেন, বললেন—নিরাপদ স্থান পাবেন কোথা, মাইল পাঁচেকের মধ্যে এতটুকু নিরাপদ জায়গা নেই। যেখান থেকে কামান চালাবেন সেইটাই হবে সবচেয়ে বেশী নিরাপদ, শত্রুর বোমা সেইখানেই কম পড়বে!

—আপনাদের কামান কতদূরে?—সরোজ জিজ্ঞেস করলো।

ক্যাপ্‌টেন সামনেই একটা ঝোপ দেখিয়ে দিলেন।

উপরের প্লেন থেকে তখন বড় বড় সার্চ্চ লাইটের আলো প্রান্তরের একদিক থেকে আরেক দিক পর্য্যন্ত গন্ধকের ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। সরোজদের মাথার উপর দিয়ে সে আলো একবার চলে গেল, চোখ ঝল্‌সে দিলে। সরোজরা চমকে উঠলো। ডেভিড জিজ্ঞেস করলে—ক্যাপ্‌টেন, তোমাদের সার্চ্চলাইট আছে?

—নিশ্চয়ই !

—বেশ, চল বলে ক'জনে অগ্রসর হোল।

কামানটা বেশীদূরে ছিল না, শ'খানেক গজ হবে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে শ'খানেক গজ বড় কম পথ নয়। কাছাকাছি যখন গিয়ে পড়েছে, এমন সময় কোথা থেকে সেই হিন্দুস্থানী মহিলাটী আবার ছুটে এল, সরোজের জামার হাতাটা টেনে ধরে বললে—বাবুজী, সাচ্ কহো, মেরি লেড়কেকো দেখা ?

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ফ্ল্যাশ্‌লাইটের আলো আরেকবার তাদের মাথার উপর দিয়ে ঘুরে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে-থাকা পুত্রের অকল্যাণে শঙ্কাতুরা মায়ের মুখখানি সেই আলোয় দীপ্যমান হয়ে উঠলো। নিমেষ মধ্যেই বুম্‌ম্ করে এক প্রচণ্ড আঘাতে সরোজের মাথার মধ্যে একশো বিদ্যুৎ একসঙ্গে জ্বলে উঠলো, পায়ের নীচের মাটীতে একটী প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে কে যেন সজোরে তাদের ফেলে দিলে ! চোখের সামনে সব আলো নিভে গেল, জেগে উঠলো মৃত্যুর ঘন দুর্ভেদ্য অন্ধকার !

কপালে ঠাণ্ডা স্পর্শ পেয়ে সরোজ চোখ চাইলে, বিশেষ কিছুই প্রথমে ঠাহর করতে পারলে না। কপালটা ভিজে উঠেছে বলে মনে হোল, হাত দিয়ে মুছে দেখে—একহাত টাটকা তাজা রক্ত !

—তবে কি তার মাথা ফেটে গেছে ? সে আহত হয়েছে ? ধড়মড় করে সরোজ উঠে বসলো। হাসপাতালটা তখনও

দাউ দাউ করে পুড়ছে। লোক জনের সোরগোল ও বেদনা-র্তের আর্ত্তনাদের রেশ শোনা যাচ্ছে। তারই সঙ্গে কানে বাজছে প্লেনের বন্‌বন্‌ শব্দ, বোমার বুম্‌বুম্‌। অনুসন্ধানী আলো তখনও ছুটে বেড়াচ্ছে প্রান্তরের এখানে সেখানে।

দেখে শুনে সদ্য-জ্ঞান সরোজের বিভ্রান্ত-প্রায় বোধশক্তি তীক্ষ্ণ জোরালো হয়ে উঠলো, ভাল করে ঠাহর করে দেখলে কতকগুলি ইতস্ততঃ ছড়ানো আহত দেহের মাঝে সে পড়ে আছে। মাথার দিকে একটী রক্তাক্ত দেহ। পিঠের জামাটা ফেঁসে গেছে, কে-যেন একটা তলোয়ারের কোপ বসিয়ে তার পিঠটা দুভাগ করে দিয়েছে। অজস্রধারায় রক্ত ঝরে জামাটা লাল হয়ে গেছে, মাটীর উপরেও রক্ত জমে জমে কালো হয়ে উঠেছে। তার মাথার অবস্থাটাও অমন হয়নি তো?—চকিতে কথাটা মনে হওয়ামাত্রই সরোজ অতি সন্তর্পণে মাথাটা একবার হাত বুলিয়ে দেখলে, কিছু না পেয়ে আর একবার ভাল করে হাত বুলালে!—নাঃ সে তো আহত হয়নি, ওই লোকটীর রক্ত তাহলে তার মাথায় লেগেছে।

—কে ও?

লোকটীর মুখ দেখার জন্য সরোজ সন্তর্পণে দেহটীকে উল্টে দিলে। মুখখানি রক্তাক্ত। তবু চেনা যায়।—সে আর্টিষ্ট রবিদত্ত। চোখের কোলে, গালের উপরে, মাথার চুলে রক্ত জমে কালো হয়ে গেছে। সে-মুখের পানে তাকিয়ে সরোজের

সারাদেহে আতঙ্কের একটা শিহরণ বহে গেল, পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত যেন শিথিল হয়ে গেল। পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত সে কতক্ষণ শুধু তাকিয়েই রইল। মনে পড়লো জার্মান্ যুদ্ধের কথা। এর চেয়েও কত ভীষণ, কত ভয়াবহ ঘটনা তখন তার চোখের সামনে ঘটে গেছে, কিন্তু তখন প্রথম-যৌবনের উদ্দাম মনে তার ছায়া পড়েনি, কোন বিস্মৃতির তলে সে-সব আজ তলিয়ে গেছে। আজ প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌছে মনের সে-তেজ আর নেই। আজ এই ব্যাপক হত্যার বীভৎসতা সইবার মত মনের দৃঢ়তা সরোজ হারিয়ে ফেলেছে, আজ তার মন আতঙ্কে সঙ্কুচিত হয়ে উঠছে, শিউরে উঠছে।

রবিদত্তের রক্তাক্ত দেহের পানে সরোজ তাকিয়ে রইল, স্তব্ধ অপলক চোখে, নিথর নিষ্কম্প দৃষ্টিতে।

—ধুম্‌ম্—ম্!

কাছেই একটা বোমা ফাটলো, বারুদের একটা ঝাঁঝালো ঝাপ্‌টা দম্‌কা বাতাসের মত সরোজের মাথার উপর দিয়ে বহে গেল। স্মেলিং সল্‌টের মত সরোজের মাথা চুন্‌মন্ করে উঠলো। এক নিমেষে তার চোখের সামনে পরপর চারটি মুখ ভেসে উঠলো—

ডেভিড্?

আয়েষা?

গাইড্?

ক্যাপ্‌টেন্‌ জন্‌সন্‌ ?

সরোজ চারিপাশে অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফেরালে। পাশে আরেকটী দেহের উপর চোখ পড়লো। সরোজ চমকে উঠলো।—মুণ্ড নেই, রক্তের কালো পর্দা ঠেলে কাঁধের একখানি শাদা হাড় ছিট্‌কে উঁচু হয়ে উঠেছে,—বীভৎস ! ভয়াবহ !!

সরোজ দু-হাতে চোখ ঢেকে ফেললে।

এমন সময় সরোজের কাঁধে একটা ঝাঁকানি দিয়ে কে বলে উঠলো—Don't be silly, old boy (বুদ্ধি হারিওনা বন্ধু)।

ডেভিডের গলা শুনে সরোজ ফিরে তাকালে, দেখে—ডেভিড পিছনে দাঁড়িয়ে, মুখে হাসির আভাস। বললে—তুমি হাসছ !

—আমার পুরানো সৈনিক বন্ধু, একটু-আধটু রক্ত কি আমাদের ব্যাকুল করতে পারে! চল, কামান চালাবে না ?—বলে ডেভিড সরোজের হাত ধরে উঠালে।

সরোজ জিজ্ঞেস করলে—আয়েষা ? ক্যাপ্‌টেন ?

—আয়েষা এইখানেই কোথাও পড়ে আছে।

—ক্যাপ্‌টেন ?

ক্যাপ্‌টেনের পাশেই তো বোমাটা পড়লো! ওই দেখ কোরার একখানি হাত ওখানে পড়ে আছে, হাতের জামায় ষ্ট্রাইপ্‌ লাগানো…বলে ডেভিড একখানি হাত দেখিয়ে দিলে। হাতের সঙ্গে খাকী জামার খানিকটা ছিঁড়ে পড়ে আছে, তার

উপর একটা তারা ও তিনটে ষ্ট্রাইপ্ হাসপাতালের আগুনের আভায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ডেভিড বললে—আমাদের অবস্থাও ও-ই হোত, কেবল আমাদের কাঁধের উপর লোক ছিল বলে। আর্টিস্ট ও গাইড দুজনের জীবনের মূল্যে আমরা দুজন বেঁচেছি। রবিদত্তকে তুমি তো দেখতেই পাচ্ছ, আর ওই মুণ্ডহীন দেহটাই আমাদের গাইডের। টাকার লোভে আমাদের পথ দেখাতে এসে বেচারা মারা পড়লো! আমাদের হয়তো ওই পথেই যেতে হবে আর খানিক পরে—

ডেভিডের কথা সমর্থন করে বোমা ফাটলো—বুম্ বুম্ বুমম্!

ডেভিড সরোজের হাত ধরে টানলে, বললে—চল, কামান চালাবে না? ওদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে না?

—কিন্তু আয়েষা?

—যাহান্নমে যাক্ আয়েষা! এখনও যদি কামান চালিয়ে এই বোমাবর্ষণ বন্ধ করতে পার, তাহলে আয়েষাকে খুজে পাবার অনেক সময় পাওয়া যাবে। কিন্তু এভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে এই বোম্বার্ডমেণ্টের মধ্যে দশ মিনিট পরে আমাদেরই আর খুজে পাওয়া যাবে না—come on!

ইতিমধ্যে আরেকবার তাদের মাথার উপর দিয়ে সন্ধানী আলোর ঢেউ বয়ে গেল। এক ঝলক দমকা হাওয়া গন্ধকের গন্ধ বয়ে আনলো। অসংখ্য আর্তনাদের ক্ষীণ রেশ ভেসে এল

আয়েষা বন্দুকের ট্রিকার টিপ্‌লো। —১৩৮ পৃষ্ঠা

সেই হাওয়ার ঝাপ্‌টায়। সরোজের মনে হোল, কে যেন আবার তাকে জিজ্ঞেস করছে—মেরী লেড়কাকো দেখা বাবুজী? আর তারই সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে উঠলো সন্তানহারা মায়ের মুখখানি—এমনি কত মা এই যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত ছেলেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে! দুর্ব্বার হিংস্র আকাঙ্ক্ষায় সরোজ উত্তেজিত হয়ে উঠলো, বললে—চল—

কামানের কাছে এসে রেঞ্জ ঠিক করে নিয়ে সরোজ হাঁকলে —ডেভিড, সেল!

—ইয়েস! বলে ডেভিড গোলা চড়িয়ে দিলে।

অন্ধকার আকাশে অনুসন্ধানী আলোর উৎস দেখে জানা যাচ্ছিল, প্লেনগুলি কোথা দিয়ে চলেছে। মাথার উপরে কাছা-কাছি যেটা নজরে পড়লো সেইটিকেই লক্ষ্য করে সরোজ কামানের মুখ ফেরালে, ট্রিকার টিপ্‌লে; গোলা ছুটে গেল—শোঁ-ও বুম্‌ম্‌ করে একটা শব্দ, আগুনের একটা ঝিলিক। পর-মুহূর্ত্তেই আকাশের বুকে একটা শব্দ শোনা গেল, দেখা গেল একটা প্লেনকে জ্বলে উঠতে।

উল্লাসে সরোজ চিৎকার করে উঠলো—life for life!

ডেভিড বললে—cheerio!

ঠিক সেই সময় একটা আর্ত্তনাদ শোনা গেল। দেখা গেল একটা মানুষের আবছায়া তাদের দিকে এগিয়ে আসছে প্রেতাত্মার মত। কাছাকাছি এসে সে-মূর্ত্তি চিৎকার করে
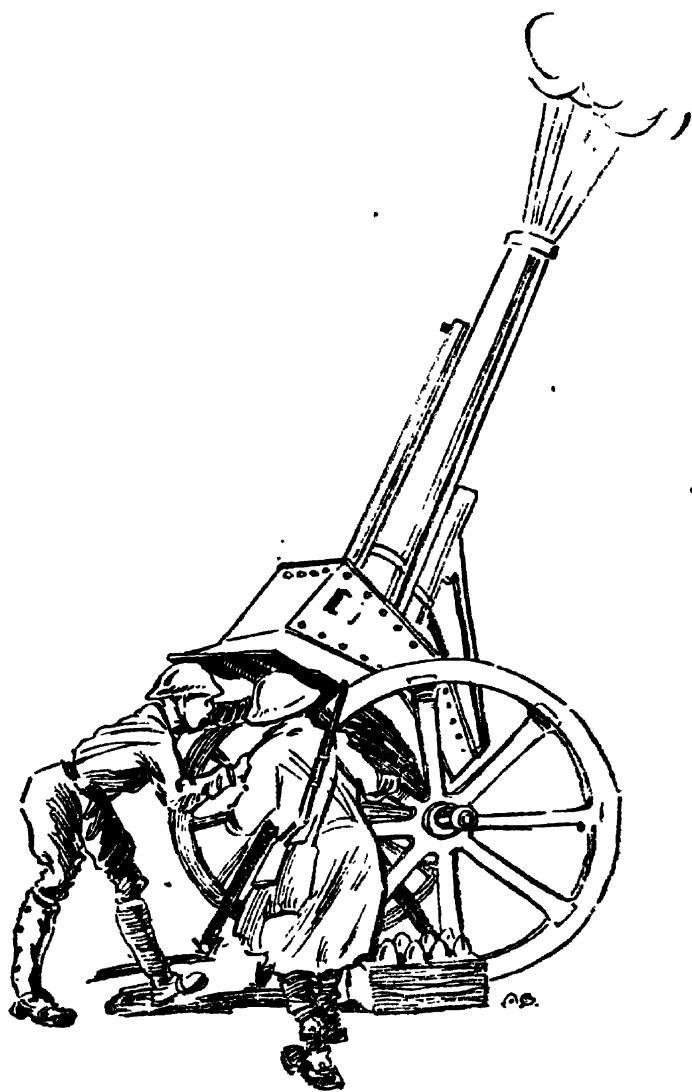
বিমান-ধ্বংসী কামান গর্জ্জে উঠল।

উঠলো—বোমা! বোমা!! আবার বোমা!!! খুন…রক্ত…

গলার স্বর শুনে ডেভিড ডাকলে—আয়েষা! আয়েষা!!

—না না, আমি সৈন্য নই, আমি সৈন্য নই! আমায় তোমরা বোমা মেরো না, আমায় তোমরা গুলি করোনা আমি লড়াই করিনি, আমি কাউকে খুন করিনি—

ডেভিড আবার ডাকলে—আয়েষা!

—না না, আমি লড়াই করিনি, আমি খুন করিনি তোমরা কেন আমায় গুলি করে মারবে! কেন আমার কোর্টমাশাল হবে!—বলতে বলতে আয়েষা ছুটে চলে
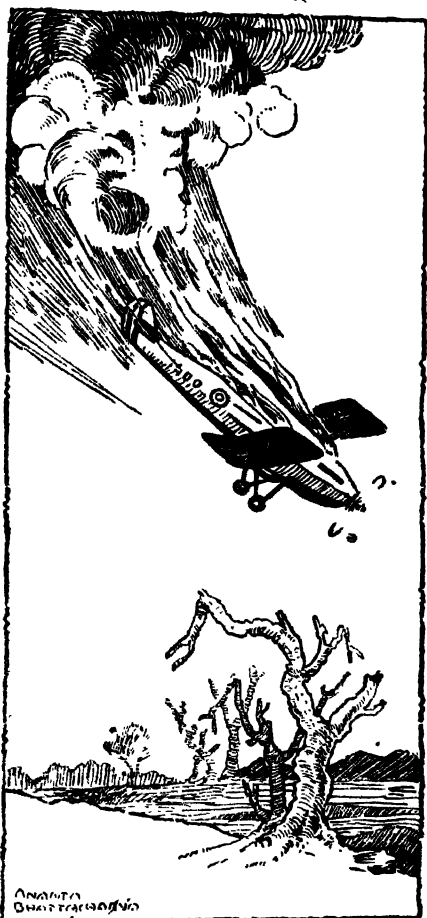
যাচ্ছিল ডেভিড এগিয়ে গিয়ে তার একখানি হাতে ধরে তাকে টেনে আনলে, একটা প্রকাণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে বললে—যাচ্ছ কোথায়? আমরা তো এখানেই রয়েছি!

আয়েষা এবার চোখ তুলে চাইলে, ডেভিড ও সরোজকে চিনতে পেরেছে বলে মনে হোল না। আতঙ্কিত দৃষ্টি তাদের মুখের উপর রেখে আয়েষা বলে উঠলো—আপনারা… আপনারা…আমায় বন্দী করবেন? খুন করবেন? গুলি করবেন? ওঃ! আমার বড় ভয় করছে—বড় ভয় করছে! আমি মরতে পারবো না!—

থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে আয়েষা সেইখানেই বসে পড়লো।

সরোজের মধ্যে তখন বিশবছর আগের জার্মানযুদ্ধের তরুণ সৈনিক-মন জেগে উঠেছে, আয়েষার পানে একবার কৃপার চোখে তাকিয়ে বললে—ও ওইখানেই পড়ে থাক্ ডেভিড, তুমি সেল্ চড়াও! বোমা ফেটে ওর ব্রেণে শক্ লেগেছে!

ডেভিড সেল্ চড়ালো!

সরোজ আকাশের পানে চোখ তুললো।

বিমান-ধ্বংসী কামান গর্জ্জে উঠলো, আকাশের দিকে গোলা ছুটে গেল—শোঁ-ও-ও-ও—বুম্।

ডেভিড উৎসাহে বলে উঠলো—Bravo, old boy!

সরোজের মাথার মধ্যে তখন যুদ্ধের দামামা বাজছে, রক্তের

মধ্যে নাচছে খুনের নেশা। কামানের মুখ ঘোরাতে ঘোরাতে সে চিৎকার করে উঠলো—life for life !

সহসা পিছনে কে প্রতিধ্বনি করলে—death for death !

সরোজ ও ডেভিড চমকে উঠলো, পিছনে শত্রুর গলা শুনলে সৈনিকেরা যেমন চমকে উঠে। ফিরে তাকালে। দেখলে—মাথায় পাগড়ী-বাঁধা একটী লোক তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে, মুখখানি চেনা-চেনা, কোথায় যেন দেখেছে !

তা' যেখানেই দেখুন না কেন, মাথা ঘামাবার দরকার বলে তারা মনে করলে না, নিজেদের কাজে মন দিলে। চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠলো শিকারী বাজের মত, মেশিনের মত চললো হাত, কানে শুনতে লাগলো প্লেনের গর্জ্জন, মনের সব একাগ্রতা হারিয়ে গেল আকাশের অন্ধকারে শত্রুর প্লেনের গতির মাঝে ! বিমান-বিধ্বংসী কামান অবিরাম আকাশের পানে গোলা উদ্গার করতে লাগলো—শোঁ-ও-ও-বুম্‌ম্‌ !

উড়োজাহাজ আর মারা গেল না, গোলা নিঃশেষ হয়ে গেল !

ইতালিয়ান প্লেনগুলি সাবধান হয়ে গিয়েছিল। আত্মরক্ষার জন্য রাত্রির অন্ধকারে সার্চ্চলাইট ফেলাই বন্ধ করে দিলে, একটু তফাতে গিয়ে মেসিনগান্ চালাতে লাগলো—অবিরাম, অবিশ্রান্ত।

সরোজ সহসা চিৎকার করে উঠলো,—গোলা, ডেভিড গোলা !

—গোলা ফুরিয়ে গেছে—ডেভিড বললে।—ফুরিয়ে গেছে! তাহলে এখন কি করি?

—এই কামানের পাশেই বসে থাকি, মরতে হয় তো এই কামানের পাশেই মরবো!

—একটু নিরাপদ জায়গা……

—এই তেপান্তরের মাঠে মাথা-বাঁচানোর মত ঠাঁই পাবে কোথা?

—তা বটে!

হতাশভাবে দুজনে কামানের পাশে বসে পড়লো।

এতক্ষণ যে লোকটী পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল এবার সে সহসা চিৎকার করে উঠলো—why do you stop? থামলে কেন?

ডেভিড বললে—সেল্ নেই!

—সেল্ নেই!—লোকটী আরো জোরে চেঁচিয়ে উঠলো—ওরা আমাদের হাসপাতাল পুড়িয়ে দিলে, আমাদের বাড়ীঘর উড়িয়ে দিলে, নিরীহ ছেলেমেয়েদের খুন করলে, আর তোমাদের গোলা নেই! এতো লোক যে মরে পড়ে আছে, ওদের মুণ্ডগুলোকে সেল কর, করে কামান চালাও—

সরোজ ও ডেভিড স্তব্ধ হয়ে লোকটির মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

লোকটী ক' সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বললে—কী, তোমরা

আমার কথা শুনবে না? জানো আমি এখানকার ইস্কুলের হেড্‌মাষ্টার, আমার আদেশ তোমারা মানবে না?—বল মান্‌বে কি না?

খানিকক্ষণ সরোজদের মুখের পানে তাকিয়ে থেকে কোন জবাব না পেয়ে আবার বলতে সুরু করলে—তোমরা আমার আদেশ শুনবে না, আচ্ছা! তোমাদের আমি গ্রেপ্তার করলুম। তোমাদের আমি চিনেছি, তোমরা ইতালিয়ান স্পাই। তোমরা আমার বন্ধু জয়চাঁদকে খুন করেছ,* হাসপাতালে তোমরাই আগুন লাগিয়েছ, 'দেসী' সহর তোমরাই বোম্বার্ড করেছ—লক্ষ লক্ষ লোকের হত্যার জন্য তোমরাই দায়ী। আমি তোমাদের গ্রেপ্তার করলুম। চল! আমি তোমাদের এখুনি নিয়ে যাব সম্রাট হেল্‌ সেলাসীর কাছে, তোমাদের এখুনি বিচার চাই! নিরীহ দুর্ব্বল নিরস্ত্র লোকদের হত্যা করে তোমরা কালা-আদ্‌মিদের সভ্য করবে? ইতালিয়ান হত্যাকারীর দল, এই তোমাদের খৃষ্ট-ধর্ম্ম? তোমরা খৃশ্চান্‌স্‌! হাহাঃ!

চারিপাশের ধূলো আর ধোঁয়ায় হাসপাতালের আগুনের দীপ্ত আভা ক্ষীণ হয়ে গেছে, সে আলোয় বক্তার মুখখানি ভাল

* শ্রীযুক্ত জয়চাঁদ ও এম-কে-জানি নামে দু'জন ভারতীয় 'দিরে-দাওয়া'র 'মহাজন-গুজরাটী ইস্কুলের' শিক্ষক ছিলেন। তাঁদের কাজ দেখে ১৯৩৫ সালে সম্রাট হেল্‌ সেলাসী তাঁদের পুরস্কৃত করেন।

করে দেখা যায় না, শুধু তার কথাগুলি স্পষ্ট হয়ে কাণের পর্দ্দায় এসে আঘাত করতে থাকে —

—আমার কথা তোমারা শুনবে না, যাবে না হেল্-সেলাসী-রাস-তাফারীর কাছে, তা আমি জানি। কিন্তু একদিন তোমাদের বিচার হবেই, এই দুনিয়ার হেল্ সেলাসী-কে ফাঁকি দিতে পারবে না, এই হত্যাকাণ্ডের কৈফিয়ৎ না দিয়ে তোমরা যাবে কোথা? তোমাদেরও একদিন মরতে হবে—

সম্রাট হেল্ সেলাসী

—শোঁ-ও-ও!

—বুম্-বুম্-বুম্!

শুধু গোলা আর গোলা!

এদিক ওদিকে কয়েকটা গোলা ফাটলো, সেই দীপ্তিতে বক্তার ঠোঁট দুখানি কাঁপতে দেখা গেল। কথা শোনা গেল গোলা-ফাটার ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি থামলে—

—তোমরা আমার মুখের পানে অমন করে তাকিয়ে দেখছ কি? ভেবেছ আমায় খুন করবে? আমি পাঞ্জাবী, আমি কি মরণকে ভয় করি? কই দাও, তোমাদের কামানের মুখ ঘুরিয়ে দাও আমার দিকে, দেখ আমি বুক পেতে দোব! মরতে আমরা ভয় পাই না, আমরা পাঞ্জাবী!

কাছাকাছি কোথা থেকে বাঁশীর সুরের মত একটা আর্ত্তনাদের করুণ রেশ ভেসে এল।

কয়েক লহমা বক্তা চুপ করে কান পেতে শুনলো, তারপরেই ছুটে চলে গেল একদিকে।

বিদীর্ণমান বোমা ও সেলের ঝলকানিতে যতক্ষণ সেই লোকটীকে দেখা যায়, সরোজ ও ডেভিড তাকিয়ে রইল।...

সকাল হতে তখন অনেক দেরী।

তারায় ঘেরা ঘন আকাশের অন্ধকারের সীমান্তে একটী নিবর্ণ আলোর রেখা ফুটে উঠেছে, এ যেন পেঁজা-পেঁজা শিথিল তুলোর বুকে সরু সূতোর ধারালো আভাস। ওই আলোই ক্রমে ক্রমে সমগ্র আকাশ ব্যাপ্ত করে দেবে, তার পিছনে আসবে লাল সূর্য্যের রক্তিমতা। বোমা যেমন আলোর দীপ্তিতে ঝল্‌সে গিয়ে চারিপাশ করে তোলে রক্তাক্ত। সেই আলোর সামনে এই যুদ্ধক্ষেত্রের সব নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড জগতের সামনে আকাশের পানে মুখ তুলে চাইবে অন্ধকারের ঘোম্‌টায় আর ঢাকা থাকবে না।

ইতালিয়ান প্লেনগুলির নীল আলো আকাশে আর দেখা যায় না।

মাঝে মাঝে বাতাসের ঝাপটা লেগে, হাসপাতালের নিভন্ত আগুন ধক্ ধক্ করে উঠে অন্ধকারকে চমকে দিচ্ছে।

কামানের পাশে সরোজ ও ডেভিড আছে বসে। দেহে ও মনে অবসাদ। গন্ধকের ধোঁয়ায় মাথাটী তখনও গুম্ হয়ে আছে। সামনে দিগন্ত-বিস্তারি অন্ধকারের পানে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে দুজনে বসে আছে। মুখে কথা নেই। কথা বলার ইচ্ছাও নেই। মাথার মধ্যে কথার ট্রেণ চলে যাচ্ছে। তান্ত্রিকের হাত থেকে বিনয়বাবু ও ডাক্তার রায়কে উদ্ধার করতে এসে রবিদত্তকে তারা হারালো, নিজেরাও বিপদাপন্ন। সকালের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই হয় তো ইতালিয়ানরা তাদের বন্দী করবে, তারপরেই হবে কোর্ট মার্শাল। নয় তো কবে কোথায় কোন্ এক সময়, ইতালিয়ান মেশিনগানের গোলা শ্যেনপাখীর মত শিষ দিতে দিতে মৃত্যুর আকাশে তাদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে। শ্যামল বাংলার বুকে আর তাদের ফেরা হবে না।

একটা দমকা হাওয়ার মত কে এসে পিছনে হোঁচট খেয়ে পড়লো, সরোজ ও ডেভিড চমকে উঠলো।

লোকটী ধীরে ধীরে উঠে বসলো, কতক্ষণ হাঁটুতে হাত বুলালো। সরোজদের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো, তারপর জিজ্ঞেস করলে—বলতে পার আর কতক্ষণ বোমা পড়বে?

মুসোলিনী আর কত বোমা ফেলবে? দেশ যে উজাড় হয়ে গেল, কাকে নিয়ে ইতালিয়ানরা রাজ্য করবে?

সরোজ তার গলা শুনেই চিনলে—ইনি সেই পাঞ্জাবী হেডমাষ্টার। বললে—বোমা পড়া তো বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

পাঞ্জাবী ভদ্রলোক তখনি কোন কথা বললে না, একবার চাইলে আকাশের পানে, একবার চাইলে সামনে যুদ্ধ-ক্ষত প্রান্তরের পানে, তার পর সহসা জোর গলায় চিৎকার করে উঠলো, ঠিক বলেছেন, ঠিক! ওরা বোমা ফেলা বন্ধ করেছে, মেশিনগানও আর চালাচ্ছে না, এখন শুধু পয়জন্ গ্যাস্ ছাড়ছে, না?

সে চিৎকারে আয়েষার ঘোর কেটে গেল, সহসা তার ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা গেল—বোমা! মেশিনগান! এখনও ওরা মেশিন-গান চালাচ্ছে? কেন ওরা আমার উপর মেশিন গান চালাবে? আমি তো ওদের কোন ক্ষতি করি নি!

আয়েষার পানে ফিরে সরোজ বললে—বোমা পড়া, মেশিনগান চালানো অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে আয়েষা, তোমার ভয় নেই। লড়াই শেষ হয়ে গেছে।

আয়েষা যেন একটু আশ্বস্ত হোল, বললে—আমি কোথায়?

—তুমি আমাদের কাছে রয়েছ—আমি সরোজ!

—সরোজ! সরোজ দা?

—হ্যাঁ।

—ওঃ সরোজদা !—আয়েষা ধীরে ধীরে উঠে বসলো।

পাঞ্জাবীটি সরোজের কথাগুলি কান পেতে শুনলে। একটু কাছে সরে এল। বড় বড় চোখ করে সরোজদের মুখের পানে তাকিয়ে দেখলে। তারপর আরো কাছে সরে এসে সরোজের হাত ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলে উঠলো—তোমরা ইণ্ডিয়ান্ ভাষায় কথা বলছ, না? তোমরা হিন্দুস্থানের লোক? গেছ কখনো হিন্দুস্থানে? দেখেছ আমাদের ভারতবর্ষ? জান হিন্দু-তান্ত্রিকেরা একশো আট শবের উপর বসে শক্তি পাবার সাধনা করে? য়ুরোপেও আজকাল সেই সাধনা সুরু হয়েছে। এ-যুগের য়ুরোপে চারজন মস্তবড় তান্ত্রিক জন্মেছে তারা কে-কে জান?—লেনিন আর কাইজার, মুসোলিনী আর হিট্‌লার! কাইজার সাধনা করেছিল পাঁচ বছর ধরে, কিন্তু বেচারার প্রাণায়ামে ভুল হয়েছিল, তাই সিদ্ধি মেলেনি, তাঁর অসমাপ্ত সাধনা শেষ করার ভার পড়েছে হিট্‌লারের উপর। লেনিনের সাধনা ছিল পাকা, তিনি যখন সিদ্ধিলাভ করলেন তখন রাশিয়ার জারকে তখ্‌ত্ ছাড়তে হোল লেনিনকে বসতে দেবার জন্য। আর এই তো দেখছ মুসোল্লিনীর সাধনা, অনেকখানি এগিয়ে এসেছে, আর দিন কতক এই অসভ্য কালো হাবসীদের এমনিভাবে মারতে পারলেই সিদ্ধি মিলে যাবে, কি বল!

পাঞ্জাবীটী কতক্ষণ সরোজ ও ডেভিডের মুখের পানে তাকিয়ে রইল একটা উত্তর শোনার আশায়।

কাছাকাছি কোথায় একটা বোমা এতক্ষণ চুপ করে পড়ে ছিল, এবার কোন একটা তুচ্ছ কারণে সেটা বুম্ করে ফেটে গেল। পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটী চমকে উঠলো, লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো, ডেভিডের মুখের পানে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলো—ওঃ তোমরা! ইতালিয়ান্ Spies, assassins, murderers (গুপ্তচর, নরঘাতক, হত্যাকারী)! মনে রেখো মরবার পরে জবাবদিহি করতে হবে—ভগবান আছে।

তারপরেই ছিট্‌কে গেল তেপান্তরের অন্ধকারে।

ডেভিড বললে—লোকটা পাগল।

সরোজ বললে—যে কোন দুর্ব্বলচিত্তের লোক এমন অবস্থায় পাগল হয়ে যাবারই কথা।

•

যুদ্ধশেষের রণক্ষেত্র।

একটা শান্ত সুদৃশ্য জনপদের মাঝে যেন একটা দীর্ঘস্থায়ী ভূমিকম্প ঘটে গেছে।

সুনিবিড় শ্যামল বনানীর বুকে যেন একটা প্রকাণ্ড ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেছে।

সুনীল সমতল সাগরের বুকে যেন একটা উত্তাল টাইফুন ঘটে গেছে।

লাঙল দিয়ে চষার পর ক্ষেতের মাটী যেমন হয়ে থাকে অবিরাম বোমা ও গোলা ফেটে চারপাশের প্রান্তরকে ঠিক

তেমনি করে ফেলেছে। এখানে সেখানে কাঁটা তারের জট, তেরপালের টুকরো, ছেঁড়া বালির বস্তা, সৈনিকের পেয়ালা, মাথার টুপী, ছেঁড়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ্, বুট, রাইফেল, মৃতদেহ। শান্ত সুশ্রী প্রান্তর বীভৎস ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। দমকা বাতাস বহে যাচ্ছে মাটী মায়ের দীর্ঘশ্বাসের মত।

সেই প্রান্তরের এক প্রান্তে আবছা অন্ধকারে চাপা অথচ স্পষ্ট গলা শোনা গেল—আমার আদেশ মনে আছে?

—আছে।

—এইমাত্র চতুর্দ্দশী তিথি পড়লো, রাত শেষ হতে আর বেশী দেরী নেই, এরই মধ্যে তোমাদের একশো আটটি নরমুণ্ড সংগ্রহ করতে হবে বুঝেছ?

—বুঝেছি।

—এই নাও দুজনে দুখানি ছোরা। মৃতদেহ দেখবে আর মুণ্ড কেটে নিয়ে থলির মধ্যে রাখবে। তুমি চুয়ান্ন আর তুমি চুয়ান্ন, বুঝেছ?

—বুঝেছি।

—যাও, আর দেরী ক'র না—

তারপর দেখা গেল, দুটি লোকের ছায়া সেই ধ্বংসস্তূপের অন্ধকারে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে নীচু হয়ে বসছে, উঠছে, তারপর আবার এগিয়ে যাচ্ছে।

কতক্ষণ পরে একটু পরিষ্কার হয়ে এল।

ছায়া দুটি তখন বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সরোজ কতক্ষণ ধরে তাদের লক্ষ্য করছিল, বললে, দূরে ওই লোক দুটো কি করছে বলত ডেভিড ?

ডেভিডও তাদের দেখছিল, বললে,—লুঠ করছে। সৈনিক-

দের পকেটে কি ব্যাগে মূল্যবান যদি কিছু থাকে, তাই লুঠ করছে বোধ হয়।

—কি নীচ মন, মড়ার দেহ থেকেও লুঠ করবে!

—কেন, এতো নতুন কিছু নয়, সব যুদ্ধক্ষেত্রেই একদল এই ধরণের লোক ঘুরে বেড়ায়, এতে অন্যায় তো কিছু নেই। একদল লোক ওদের সর্ব্বস্ব লুঠ করবার চেষ্টায় খুন করছে, সেটা যদি নীচতা না হয়, তাহলে দু.পাঁচটা লোক ওদের কোন ক্ষতি না করে মৃত্যুর পর যদি ওদের অ-দরকারী কোন-কিছু নিয়ে বড়লোক হয় তা আর নীচতা কি হোল?

ইতিমধ্যে তৃতীয় একটা লোককে এগিয়ে আসতে দেখা গেল প্রথম দুজনের পিছনে!

কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

—কতগুলি সংগ্রহ হোল?

—আমার ছাব্বিশ।

—আমার বত্রিশ।

একটা ধারালো অট্টহাসি শোনা গেল, তারপর শোনা গেল কথা—এতক্ষণে মাত্র আটান্নটা! তাড়াতাড়ি কর, রাত তো প্রায় শেষ হয়ে এল এর মধ্যে একশো-আটটা জোগাড় করতেই হবে—কালকের অমাবস্যা যেন ব্যর্থ না হয়!

তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে সহসা একজন পায়ে আঘাত লেগে পড়ে গেল।

প্রশ্ন হোল—কি হোল?

—পড়ে গেছি সাধুজী।

—সাধুজী!! বল্ গুরুদেব!

অভিভূত স্বরে প্রতিধ্বনি উঠলো—গুরুদেব !

গুরুদেব এগিয়ে গিয়ে শিষ্যের হাত ধরে তুললেন, বললেন—নে-ওঠ্, সংগ্রহ কর্।

শিষ্যটী দু-এক পা খোঁড়াতে-খোঁড়াতে এগিয়ে গিয়ে বসে পড়ে বললে—চলতে পারছি না, গুরুদেব !

—কি হোল ?

—পায়ে বড় ব্যথা।

গুরুদেব সাম্নে গিয়ে দাঁড়ালেন, বললেন—নে ওঠ্, কিচ্ছু হয়নি—

শিষ্য যন্ত্রের মত উঠে দাঁড়ালো।

গুরু বললেন, নে চল্।

শিষ্য চললো।

গুরু বললেন—পায়ে আর কোন ব্যথা আছে ?

—না।

—এবার পারবি ?

—হ্যাঁ পারবো।

শিষ্য আবার নরমুণ্ড সংগ্রহ করতে স্বরু করলো।

সরোজ ও ডেভিড তন্ময় হয়ে দেখছিল।

সহসা একসময় ডেভিডের যেন চমক ভাঙলো, সরোজকে একটা ঠেলা দিয়ে বলে উঠলো—He is the man, shoot him Saroj,—Just shoot him !

সরোজের চমক ভাঙলো, বায়োস্কোপের ছবির অর্দ্ধেকে যেন ইন্‌টার্ভেল পড়লো, কাঁধ থেকে ম্যসার রাইফেল্ নাবিয়ে সট্ করলে।

ডেভিডও বন্দুকের ট্রিকার টিপলে।

কার গুলি কাকে লাগলো ঠিক বোঝা গেল না, তবে চিৎকার করে একজন মাটীতে পড়ে গেল। পরমুহূর্ত্তেই অপর দু'জন ছুটে এল সরোজদের পানে।

তারা একটু কাছে আসতেই তাদের হাতের দুখানি ছোরা ঝিকমিক্ করে উঠলো। ডেভিড তাড়াতাড়ি সরোজের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল কামানের পিছনে।

লোক দুটী ঝড়ের বেগে ছুটে এল। সামনেই বসেছিল আয়েষা, তার মাথার উপর দুখানি ছোরা ঝল্‌মল্ করে উঠলো। সরোজ সঙীন উঁচিয়ে গুলি চালাতে যাচ্ছিল, ডেভিড চিৎকার করে উঠলো—You! Don't shoot!—বিনয় দা, ডক্‌টর রায়······

সরোজ থমকে গেল।

লোকদুটী চিৎকার শুনে চমকে উঠলো, তারপরেই দুজনের তীব্র হাসি রণক্ষেত্রকে সচকিত করে তুললো—হাহাহাঃ !!!

আয়েষাকে বাঁচাবার জন্য সরোজ ও ডেভিড তাদের সামনে লাফিয়ে পড়লো। বিনয়বাবুর হাতের ছোরাখানি এক নিমেষে সরোজ কেড়ে নিলে। বিনয়বাবু বাঘের মত লাফিয়ে পড়লো

সরোজের ঘাড়ে। সরোজ টুপ্ করে সরে গেল, বিনয়বাবু নিজের বেগেই গিয়ে পড়লেন মাটির উপরে।

ডেভিড ডক্টর রায়ের ছোরা শুদ্ধ হাতখানি চেপে ধরেছিল, নিমেষে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ডক্টর রায় আমূল ছোরাখানি ডেভিডের পিঠে বসিয়ে দেবার জন্য হাত তুললেন। ডেভিড তৎক্ষণাৎ মাটিতে শুয়ে পড়ে ডান পা হুকের মত আটকে, বাঁ পায়ে ডক্টর রায়ের হাঁটুতে সজোরে এক লাথি মারলেন, যুযুৎসুর সে পাঁচ ডক্টর রায় সইতে পারলো না, ঠিক্‌রে গিয়ে পড়লো।

ভয়ে ও উত্তেজনায় আয়েষা আর্ত্তনাদ করে উঠলো।

এদিকে বিনয়বাবু ও ডক্টর রায় আর মাটী থেকে ওঠে না। মারামারিটা যখন প্রবল হয়ে উঠবে বলে মনে হচ্ছিল, মারাত্মক রকমের আঘাত পাবার জন্য সরোজেরা মনে মনে তৈরী হচ্ছিল, এহেন সময় বিনয়বাবু ও ডক্টর রায়ের মাটী থেকে না-ওঠা বিস্ময়কর বলে মনে হোল। বিশেষ কোন আঘাত করা হয়নি অথচ তারা ওঠে না কেন, ভাণ করে সুযোগের প্রতীক্ষা করছে নাকি!

কিন্তু যখন একই ভাবে ক'মিনিট কেটে গেল, তখন সরোজ ও ডেভিড কাছে গিয়ে সন্তর্পণে নেড়ে-চেড়ে দেখে দুজনেই অচেতন।

ডেভিড সরোজের মুখের পানে তাকিয়ে হেসে বলল—খুব

বন্ধু যা হোক, যাদের জন্য আমরা এই হাবসী মুল্লুক পর্য্যন্ত ছুটে এলুম, তারা আমাদের দেখেই ছুরি নিয়ে তেড়ে এল—চমৎকার বন্ধুত্ব!

সরোজ বললে—তুমি কি ভাব, ওরা সুস্থ মনে আমাদের ছুরি মারতে এসেছিল?

—আমার মনে সন্দেহ হয় ওরা দুজনেই হিপ্‌নোটাইজড্‌!

—সন্দেহ নয়, নিশ্চয়ই। না হলে দুজন সুস্থ লোক অকারণে এমনভাবে কখনও অজ্ঞান হয়ে যায়? শুনেছি সম্মোহিত লোকের মনে পূর্ণচেতনা থাকে না, সামান্য উত্তেজনা-তেও তাই তারা অজ্ঞান হয়ে যায়। তা ছাড়া বোম্বায়ের নিশির ডাক থেকে সুরু করে এই যুদ্ধক্ষেত্রে নরমুণ্ড সংগ্রহের ব্যাপার পর্য্যন্ত ভাল করে ভেবে দেখ দিকি, কোন সুস্থ চিত্তের লোক বন্ধুবান্ধব, আপনার জনদের ভুলে কোন সাধুকে এমন কুকুরের মত অনুসরণ করতে পারে, না আমাদের মত অতি অন্তরঙ্গ দুজন বন্ধুকে ছোরা নিয়ে আক্রমণ করতে পারে, বল? ওদের দুজনকেই সন্ন্যাসীটা হিপ্‌নোটাইজ্‌ করেছে—

সন্ন্যাসীর উল্লেখ করতে ডেভিড সচকিত হয়ে উঠলো, বললে—সন্ন্যাসীটাকে তো ধরা হোল না, ব্যাটা গুলি খেয়ে ওখানে পড়ে আছে—

—তুমি এদের দেখ, আমি দেখে আসি—সরোজ এগুলো।

ডেভিড বললে—একা যাওয়া ঠিক হবে না, দুজনে যাই—

দুজনেই গেল। যেখানে সন্ন্যাসীটী পড়ে গেছিল, সেখানে একটী মৃত ঘোড়া ও একজন মৃত হাবসী সৈন্য পড়ে আছে, সন্ন্যাসী নেই। স্থান ভুল হয়েছে মনে করে তার চারিপাশে প্রায় আধমাইল জায়গা তারা সন্ধান করলে, কিন্তু সেই প্রভাতী আলোয় সন্ন্যাসীর চিহ্নমাত্রও দেখা গেল না।

সরোজ বললে—আমাদের চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়ে গেছে।

ডেভিড বললে—যে সময় বিনয়দা ও ডক্‌টর রায়কে নিয়ে আমরা ব্যস্ত ছিলাম সেই অবসরে সরে পড়েছে। কিন্তু গুলি খেয়েও পালিয়ে গেল!

সরোজ বললে—গুলি লাগে নি হয়তো। আমাদের ঠকাবার জন্য গুলি লাগার ভাণ করে পড়ে গেছিল। নাহলে, কোন আহত লোক এতো তাড়াতাড়ি আধমাইল ছাড়িয়ে যেতে পারে না।

দুজনে ফিরলো।

কতক্ষণ পরে বিনয়বাবু ও ডক্‌টর রায়ের জ্ঞান হোল।

চোখ মেলে কতক্ষণ সরোজ ও ডেভিডের মুখের পানে তাকিয়ে বিনয় জিজ্ঞেস করলে—তোমরা কে ?

—আমরা সরোজ,…ডেভিড…

—সরোজ…ডেভিড…সরোজ…ডেভিড…সরোজ ডেভিড.

—জপমালার মত বিনয়বাবু কতক্ষণ নাম দুটী জপ করলেন। তারপর সহসা চমকে উঠলেন—ওঃ, বুঝেছি, সরোজ আর ডেভিড, না?

—হ্যাঁ।

—এ কোন জায়গা?

—আবিসিনিয়া।

—আবিসিনিয়া···আবিসিনিয়া···আবিসিনিয়া কোথায়?

—আফ্রিকায়।

—আফ্রিকায় কেন?

—তোমাদের গুরুদেব এখানে তোমাদের নিয়ে এসেছে—

—আমাদের গুরুদেব? আমার আবার গুরু কে?

—একজন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী, যে তোমাদের এখানে ধরে এনেছে।

—আমাদের ধরে এনেছে, আর আমরা জানি না? তোমরা বাজে কথা বলছ!

সরোজ ও ডেভিডের মুখে হাসি খেলে গেল, বললে—যদি জানতেই পারবেন, তাহলে আর হিপ্‌নোটাইজ্ করবে কেন?

বিনয়বাবু খানিকক্ষণ অবিশ্বাস ও বিস্ময়ে সরোজদের মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন, তারপর উঠে বসতে গিয়ে কাৎরে উঠলেন—উঃ!

-কি হোল—সরোজ ও ডেভিড একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলো।

বিনয়বাবু হাতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসলেন, তারপর ডান পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—বড় লেগেছে পা'টায়, বড় ব্যথা—

সরোজ দেখলে বিনয়বাবুর ডান পায়ে হাঁটুর নীচে খানিকটা কেটে গিয়ে বেশ ফুলে উঠেছে। বললে—ও কিছু না, আমরা এখুনি ওটা ব্যাণ্ডেজ করে দিচ্ছি—

ডেভিড বললে—কি দিয়ে বাঁধবে ?

সরোজ বললে—সে ঠিক আছে, আয়েষার মাথায় যে রুমাল-খানি বাঁধা আছে ওইতেই হবে—

ডেভিড বিনয়বাবুর পাখানি একবার পরীক্ষা করলে। সরোজ আয়েষার কাছ থেকে রুমালখানি চেয়ে নিলে, কিন্তু বাঁধতে গিয়ে দেখা গেল, রুমালখানি যথেষ্ট নয়। ডেভিড বললে—এখন ?

—আমার জামা ছিঁড়ে বেঁধে দিচ্ছি—

—কিন্তু আফ্রিকার এই মশামাছির দেশে, গায়ের ওই একমাত্র জামাটা ছিঁড়ে ফেলা কি ঠিক হবে ?

—তাছাড়া আর উপায় কি ?—বলে সরোজ জামা খুলতে যাচ্ছিল, আয়েষা বাধা দিয়ে বললে—না না, আপনাকে জামা ছিঁড়তে হবে না, এই নিন্ আমার আঙরাখাটা, ভিতরে আমার অন্য পোষাক আছে—

আয়েষা নার্সের আঙরাখাটা খুলে দিলে, তার পরণে তখন পূরোদস্তুর সৈনিকের য়ুনিফর্ম।

সেই আঙ্‌রাখাটা ছিঁড়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময়—

পিছন থেকে আদেশ শোনা গেল—Hands up—হাত মাথার উপর তুলে ধর !

সকলে চমকে উঠলো। ফিরে দেখে সঙীন উঁচিয়ে গোটা দশ-বারো ইতালিয়ান তাদের কাছে এগিয়ে এসেছে।

সরোজ ও ডেভিড ইতস্ততঃ করে উঠলো।

আবার আদেশ হোল—Hands up !

সকলে মাথার উপর হাত তুললো।

ইতালিয়ান সৈনিকেরা এগিয়ে এসে তাদের বন্দুক কেড়ে নিলে। সকলে বন্দী হোল।

পূবদিকের আকাশ তখন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বাভাসে দীপ্তিময় হয়ে উঠেছে।

ইতালিয়ান্ তাঁবুগুলির সামনের মাঠে কোর্ট মার্শাল্ বসেছে।

ছ'জন ব্রিটিশ্ স্পাইয়ের বিচার হচ্ছে।

সাম্‌নে তিনজন সৈন্যাধ্যক্ষ। তাদের পিছনে কয়েকটী সেক্‌সন্ সৈন্য। মাঝে দাঁড়িয়ে আছে ছ'জন বন্দী।

প্রথমে একজন ইতালিয়ান্ এল, সরোজরা দেখেই চিনলে, ইনি সেই এড্‌জুটেন্ট, যার ছাউনি থেকে কদিন আগে তারা পালিয়ে এসেছিল। সাক্ষী হিসাবে এড্‌জুটেন্ট বললে—এদের

প্রত্যেককেই আমি চিনি। এরা বৃটিশ স্পাই। কদিন আগে ট্রেনে করে এরা আদ্দিস্-আবাবায় যাচ্ছিল তখন আমি এদের আটক করি। এরা বৃটিশ গুপ্তচর জানতে পেরে সামরিক আদালত বসিয়ে এদের গুলি করে মারার আদেশ দি'। সেই রাত্রে রক্ষীদের খুন করে এরা পালিয়ে যায়।

এড্‌জুটেন্ট থামতেই সরোজ বললে—আমাদের নামে কি কথা উনি বললেন আমরা কেউ বুঝতে পারলুম না। আমরা কেউ ইতালিয়ান ভাষা জানি না, ইংরাজীতে আমাদের বিচার হোক।

সরোজের ইংরাজী কথা বিচারকদের মধ্যে কেউ বুঝতে পারলো কি না কে জানে, তবে তাদের চোখের দৃষ্টি হিংস্র হয়ে উঠলো, ভ্রূ হয়ে উঠলো কুঞ্চিত। তারপর বিচারকদের মধ্যে প্রথম সৈন্যাধ্যক্ষ সহসা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে বলে উঠলো—তোমাদের বিরুদ্ধে তিনদফা অভিযোগ—গুপ্তচরবৃত্তি, খুন, পালায়ন।

ডেভিড প্রতিবাদ করলে—মিথ্যা কথা, আমরা বৃটিশ স্পাই নই, আমরা রক্ষীদের খুন করি নি।

পাশের এক সৈনিক ডেভিডের পাঁজরে বন্দুকের নলের একটা খোঁচা দিয়ে চাপা গলায় গর্জ্জে উঠলো—সাই-লেণ্ট!

এবার এড্‌জুটেন্টের পানে তাকিয়ে বিচারক বলে উঠলেন—তিনদফা অপরাধ: গুপ্তচর, খুনী, পলাতক?

এড্‌জুটেন্ট মাথা নেড়ে বললেন, ইয়েস্ স্যার।

বিচারক প্রথম বন্দীকে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার নাম ?

—আমার নাম ডক্‌টর জানি, আমি একজন হিন্দু ডাক্তার !

সরোজ ও ডেভিড চিনলে, ইনি সেই যুদ্ধক্ষেত্রের পাঞ্জাবী ভদ্রলোক।

বিচারক বললেন—হিন্দু—ইণ্ডিয়ান ?

ডাক্তার জানি চমকে উঠলো, তাড়াতাড়ি বললে—না না, আমি হিন্দু নই, আমি ইণ্ডিয়ান নই আমি যিশুখৃষ্ট—আমি আবিসিনিয়ার যিশু। তোমরা আমায় ক্রুশ-বিদ্ধ করবে বলে তোমাদের হাতে আমি ধরা দিয়েছি। পরম পিতার কাছে তোমাদের জন্য আমি কল্যাণ কামনা করি। তোমাদের মুসোলিনী দীর্ঘায়ু হোন, তিনি যুগে-যুগে নব-নব রোম সাম্রাজ্য গড়ে. তুলুন। রেড্‌-ক্রশ্‌-সোসাইটির উপর বোমা ফেলে, হাসপাতাল সুদ্ধ মুমূর্ষু ও আহতদের পুড়িয়ে মেরে, অসভ্য নিরীহ কালাআদ্‌মিদের পয়জন্‌-গ্যাসে হত্যা করে. তোমাদের ফ্যাসিস্ত বাহিনী অজেয় হয়ে উঠুক—দিকে দিকে রোমক সভ্যতা প্রচার করুক !

ডাক্তার জানির ইংরাজী কথা সবাই বুঝতে পারুক আর নাই পারুক বিচারক মণ্ডলী চঞ্চল হয়ে উঠলো এবং পরস্পরের মুখের পানে চাইলো।

কয়েক লহমা চুপ করে থেকে ডাক্তার জানি বলে উঠলো—কই ? আপনারা চুপ করে আছেন্‌ কেন ? আমায় মৃত্যুদণ্ড

দিন। এই সাজানো আদালতের সামনে কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে? কতক্ষণ আর এই বিচারের অভিনয় দেখবো? আমায় গুলি করে মারার আদেশ দিন্!

কি ভেবে প্রথম বিচারক প্রশ্ন করলেন—যদি তোমায় গুলি করে মারার আদেশ না দিই?

ডাক্তার জানি চমকে উঠলো, বক্তার মুখের পানে একবার স্থিরদৃষ্টিতে তাকালো, তারপরেই বলে উঠলো—ঠিক কথা, গুলি করে তো আমায় মারা হবে না, আমি যে যিশু! আমায় ক্রুশে বিঁধে মারবে তো? বেশ!

বিচারক-মণ্ডলী বুঝলেন লোকটার মাথা বিকৃত হয়েছে।

প্রথম বিচারক বল্লেন—তোমায় আমরা মুক্তি দেব।

—মুক্তি? প্রাণভিক্ষা! নিষ্ঠুর ইতালিয়ান সেনার কাছ থেকে প্রাণভিক্ষা নেব! যারা মুখোমুখি যুদ্ধ করতে ভয় পায়, নিরস্ত্র নগরবাসী, নিরীহ নর-নারী ও শিশুর উপর রাত্রির অন্ধকারে লুকিয়ে বোমা মারে, বিষ-গ্যাস ফেলে—তাদের কাছে প্রাণভিক্ষা! আমরা পাঞ্জাবী, আমরা বীরপুরুষের কাছে মাথা নোয়াই, কাপুরুষের কাছে, খুনীর কাছে আমরা প্রাণভিক্ষা চাই না। ন্যায়ের নামে, সত্যের নামে, ধর্ম্মের নামে তোমাদের কাছ থেকে আমি কৈফিয়ৎ চাই। এমনভাবে হত্যা করার অধিকার তোমাদের কে দিলে? কামান, বোমা, এরোপ্লেন আর বিষগ্যাসই কি সব, মনুষ্যত্ব নেই? ভগবান নেই? একদিন তাঁর

কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না? শাদা আদ্‌মি বলে জগদীশ্বর কি তোমাদের রেহাই দেবেন? বল, আমার কথার জবাব দাও?

রাগে বিচারকদের চোখ লাল হয়ে উঠলো। প্রথম বিচারকটী এবার গর্জ্জন করে উঠলেন—Damn your God—তোমার জগদীশ্বর জাহান্নামে যাক্!

ডাক্তার জানি হা হা কার হেসে উঠলো, বললে—ভগবানকে ভুলে গেছ কম্যাণ্ডার? শয়তানের পূজো করছ—বেশ, বেশ!

বিচারক বললে—তোমার মত রাস্‌কেলের হাসি কি করে থামাতে হয় আমি জানি!

—আমায় ভয় দেখাচ্ছ কম্যাণ্ডার? পাঞ্জাবীরা মরতে ভয় পায় না, আমরা ইতালিয়ান্ নই, হাহাঃ—ডাক্তার জানি আরো জোরে অট্ট হাসি হেসে উঠলো।

বিচারক একজন সৈনিককে ইসারা করলেন, সে এগিয়ে এসে ডাক্তার জানিকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গেল।

ডাক্তার জানির পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বিনয়বাবু। বিচারক কম্যাণ্ডার এবার তার পানে দৃষ্টি ফিরিয়ে প্রশ্ন করলে—তুমি ভারতীয়?

বিনয়বাবু মাথা নেড়ে জানালেন—হ্যাঁ।

বিনয়বাবুর পাশে ছিল ডাক্তার রায়, তাকেও প্রশ্ন করা হোলো—তুমি ভারতীয়?

—হ্যাঁ।

তারপাশে সরোজ।

তারপর ডেভিড।

শেষে আয়েষা।

সকলকে সেই একই প্রশ্ন, সেই একই উত্তর।

শুধু আয়েষার বেলা বিচারকদের মধ্যে একজন পরিষ্কার ইংরাজীতে জিজ্ঞেস করলেন—এই পাঁচজন বন্দীর মধ্যে তোমার আপনার লোক কেউ আছেন ?

—আছেন, আমার দুই ভাই।

—কে কে ?

আয়েষা সরোজ ও ডেভিডকে দেখিয়ে দিলে।

বিচারক অপর দুজন বিচারককে কি বললে, তারা মৃদু মাথা নাড়লে।

তারপর প্রথম বিচারক উঠে দাঁড়ালো, বন্দীদের পানে তাকিয়ে বললে—তোমাদের অপরাধ তিন দফা। প্রথমতঃ, তোমরা ইংরাজের গুপ্তচর, দ্বিতীয়তঃ তোমরা সোমালী সৈন্যকে খুন করেছ, তৃতীয়তঃ, তোমরা পলাতক আসামী। এর যে কোন একটা অপরাধের সাজা হচ্ছে মৃত্যু। তোমাদেরও আমি সেই মৃত্যুদণ্ডেই দণ্ডিত করলুম।

ফস্ করে সরোজ বলে ফেললে—মহামান্য ইতালিয়ান বিচারক, আপনার ন্যায়-বিচারের জন্য ধন্যবাদ।

সরোজ বুঝতে পেরেছিল এই বিচারের আড়ম্বর একটা

অভিনয় মাত্র। এর উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া। মরতেই যখন হবে তখন কিসের ভয়? ইতালিয়ানদের উপহাস করার লোভটুকু তাই সারোজ সামলাতে পারে নি, যুদ্ধক্ষেত্রের ভীষণতা মরণের ভয় তার মন থেকে মুছে দিয়েছিল।

সরোজের উপহাসে বিচারকের মুখ লাল হয়ে উঠলো। অন্যসময় হ'লে তিনি নিজেই লোকটাকে গুলি করে মারতেন। তবে কিনা এখন বিচারকের আসনে বসে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন, এই যা কথা। এড্‌জুটেন্টকে ডেকে তিনি কি আদেশ করলেন। এড্‌জুটেণ্ট স্যালুট দিয়ে ফিরে গেল। তখুনি বিউগিল বাজলো। এড্‌জুটেণ্টের আদেশে সরোজ, ডেভিড ও আয়েষাকে সৈনিকেরা একপাশে সরিয়ে নিয়ে গেল। বিচারকদের সামনে মাঠের মাঝে বিনয়বাবু, ডাক্তার রায় ও সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোককে হাঁটু পেতে বসিয়ে দেওয়া হোল। তারপরেই এডজুটেণ্টের তীক্ষ্ণ কণ্ঠের আদেশ শোনা গেল—শ্রেণী, সার দাও—!

ক'জন সৈনিক এগিয়ে এসে এক সারিতে দাঁড়ালো।

—বন্দুক কাঁধে ন্যাও—

—লক্ষ্য ঠিক রাখো—

কাঁধ থেকে নাবিয়ে সৈনিকেরা বন্দুক ডান বাহুতে চেপে ধরলো, ট্রিকারে তর্জ্জনী রেখে নলের মাছি স্থির করে ধরলো বিনয়বাবুদের দিকে।

আর একটি মুহূর্ত্ত, তারপরেই সব শেষ। সরোজ ও ডেভিডের মাথার মধ্যে কি যেন ঘটে গেল। মনে হোল চোখের নিমেষে ওদের বন্দুকের সামনে থেকে বিনয়দা ও ডাক্তার রায়কে ছোঁ মেরে নিয়ে আসে। সরোজ ও ডেভিড লাফিয়ে উঠলো। দুজন করে জোয়ান সৈনিক তাদের দুটো করে হাত ধরেছিল, সজোরে এক ঝট্‌কা মেরে তারা সরোজ ও ডেভিডকে ঠাণ্ডা করে দিলে। ঠিক সেই সেকেণ্ডে আগুনের মত তাদের কানে এসে বাজলো শেষ আদেশ—ফায়ার!

কট্ কট্ কট্ কট্ করে একসঙ্গে কয়েকটা বন্দুকের ট্রিকার টেপারি শব্দ হোল, কড় কড় কড় করে কয়েকটি গুলি ছুটে গেল। চোখের সামনে তিনটা সবল প্রাণবন্ত দেহ আহত অবশ হয়ে ধপ্ ধপ্ করে মাটির উপর লুটিয়ে পড়লো।

আবার আদেশ শোনা গেল—শ্রেণী পিছু ফেরো, এ-জেঁৎ!

সৈনিকের সারি পিছু ফিরলো। তারপর তাদের অনেক-গুলি ভারী বুটের সমতালে পা ফেলার শব্দ কাছ থেকে দূরে চলে গেল।

সরোজ ও ডেভিড স্তম্ভিত হয়ে নিশ্চল পাষাণ মূর্ত্তির মত তাকিয়ে রইল তিনটা গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত দেহের পানে।

আয়েষার মাথাটা কেমন যেন ঘুরে গেল, থর থর করে কেঁপে একটা আর্ত্তনাদ করে উঠেই সে টলে পড়লো। সেই আর্ত্তনাদে সরোজ ও ডেভিডের চমক ভাঙলো।

তরুণ ইতালিয়ান বিচারকটি তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে এল—আয়েষাকে সাহায্য করতে।

তিনটী পৃথক তাঁবুতে তিনজনকে রাখা হয়েছে।

তিনজনের মাথার মধ্যে ঝড় বইছে।

সরোজ এক সেকেণ্ড সুস্থির হতে পারছে না। যাদের জন্য এতো কষ্ট সহে এখানে আসা, তাদেরকেই বাঁচানো গেল না। চোখের উপর তাদের কোর্টমার্শাল্ হয়ে গেল, তারা কিছুই করতে পারলো না। এই না-পারার দুঃখটাই সরোজের মনের মধ্যে আলোড়ন তুলল, বাকী সব চিন্তা সে ভুলে গেল। কোর্টমার্শালে তাদেরও যে মৃত্যুদণ্ড হয়েছে সে-কথা সরোজের মনে রইল না। দু-একদিনের মধ্যে তাকেও যে অমনিভাবেই গুলি করে মারবে, সেজন্য তার কোন চিন্তা নেই। সে কিছুতেই ভাবতে পারছে না। মাথাটা দপ্ দপ্ করছে। খাঁচায় বন্ধ বাঘের মত সে ছটফট করতে লাগলো। এবার এককোণে বসে পড়লো। একটু সুস্থির হয়ে সব ঘটনাটী চিন্তা করবার চেষ্টা করলে। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে কিসের জন্য একটা বেদনা বোধ, একটা জ্বালা তাকে চুপ করে বসে থাকতে দিলে না। উঠে পড়ে দুহাতে মাথাটা চেপে ধরে সে তাঁবুর মধ্যে আবার পায়চারী করতে সুরু করলে।

ডেভিডের অবস্থা ঠিক সরোজের মত। একা একা তাঁবুর

সরোজ লাফিয়ে প্লেনে উঠে বসলো

—২৩৯ পৃষ্ঠ

মধ্যে সে ছট্‌ফট্ করছে। বিনয়বাবুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়-দিন থেকে আজ এই মৃত্যু-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এক একটি দিনের ঘটনা তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। মাথার মধ্যে সব যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। সব অনুভূতিকে কে যেন আগুনে ঝল্‌সে এক আকার করে দিচ্ছে।

আয়েষার মাথাটা বড় দুর্ব্বল বলে মনে হচ্ছে। তাবুর একটা খুঁটিতে ঠেস্ দিয়ে সে বসে আছে। মৃত্যুর বীভৎসতা তার মনের আকাশকে ঢেকে দিয়েছে। রাত্রির অন্ধকারের মতই তার মন ভয়ে আতঙ্কে আচ্ছন্ন। এ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের ঝাপ্‌টা সে আর সইতে পারছে না। কেন সে স্বজাতির মায়ায় স্বদেশের মোহে আরবী পিতার আশ্রয় ছেড়ে চলে এল। বেশ শান্তিতে ছিল সেখানে। পরস্পরকে খুনোখুনি করার এমন রক্তাক্ত রূপ কোনদিন চোখে পড়েনি। নিজের দোষে আজ সেই মৃত্যুই তার মাথার উপরে নেবে এসেছে। তারও আজ মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। বিনয়বাবুদের মত তার দেহটাও গুলি খেয়ে রক্তাক্ত হয়ে পড়ে থাকবে। আয়েষা আর ভাব্‌তে পারল না। দুহাতে মুখ ঢেকে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। তার জীবনে এমন দুর্য্যোগের দিন এমন নিশ্চিত মৃত্যুর বারতা নিয়ে কখনও আসে নি।

অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হয়েছে। রাত প্রায় আটটা হবে। চাঁদের

আলোয় ইতালিয়ান সেনাদের তাঁবুগুলি পিরামিডের মত দেখাচ্ছে। দু-একটী তাঁবুর মাথায় বড় বড় ইতালিয়ান্ পতাকা উড়ছে। তাঁবুর মধ্যে থেকে মাঝে মাঝে হাসি ও হুল্লোড়ের শব্দ ভেসে আসছে। বাহিরে সব স্তব্ধ। এদিকে কালো কালো মেসিন গান আর ট্যাঙ্ক গুলির পানে তাকালে মনে ভয় হয়, হিংস্র একদল পশু যেন শিকারের আশায় ওৎ পেতে বসে আছে। ওদিকের মাঠে রূপোলী প্লেনগুলি যেন এক একটী ঘুমন্ত বক। রাত্রির অন্ধকারে চারিপাশের জীবন যেন ঢাকা পড়ে গেছে, শুধু আকাশের গায় মিটু মিটে তারাগুলি আর দূরে সোমালি প্রহরীদের চলমান ছায়া।

একটী তাঁবুর মধ্যে একখানি ক্যাম্প-চেয়ারে একজন সেনানায়ক বসে আছে। বয়স কম। সৈনিকের নিষ্ঠুরতা তখনও সে মুখ কঠোর করে তোলেনি। সুপুরুষ, লম্বা সুঠাম চেহারা, বয়সের তুলনায় যেন বেশী জোয়ান মনে হয়। জয়ের আনন্দে তার মুখে মৃদু হাসির আভাষ, মন উৎফুল্ল। সামনে একটা টেবিলের উপর লাল নীল দাগ দেওয়া একখানি বড় আবিসিনিয়ার ম্যাপ খোলা পড়ে আছে। নিবিষ্ট মনে সে সেইটা দেখছে। মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকাচ্ছে বাহিরের অন্ধকারের পানে, কখনও-বা চোখের সামনে ঝুলানো হারিকেন লণ্ঠনটীর পানে, কখন-বা তাঁবুর পর্দা ঝুলানো দরজার পানে। সহসা মানচিত্র-খানি টেবিলের উপর রেখে অস্থির ভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে

দাঁড়ালো। ঠিক সেই মুহূর্তে একজন সৈনিক পর্দা ঠেলে ভিতরে ঢুকে কুর্ণিশ করলো, তার সঙ্গে একটী মেয়ে।

মেয়েটাকে দেখতে চমৎকার, সরস্বতী প্রতিমার মত লাবণ্যময়ী, ফুলের পাপড়ির মত কমনীয়, সকালের শিশিরের মত স্নিগ্ধ। পরণে তার সৈনিকের খাকী পোষাক, দেখলে মনে হয় যেন ফরাসী ইতিহাসের পাতায় দেখা 'জোয়ান-অ-আর্কের' ছবিখানি হঠাৎ প্রাণবন্ত হয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

সেনানায়ক মেয়েটির পানে তাকিয়ে বাতাসে মাথা ঠুকে বললে—গুড্ ইভ্নিং।

মেয়েটাও প্রতি অভিবাদন করলে—গুড্ ইভ্নিং।

—আপনার নাম কি?

—আয়েষা দেবী।

—আপনি ভারতবাসী?

—আগে ভারতবাসী ছিলাম বটে, এখন আবিসিনিয়াবাসী।

ভারতের লোকেরা যে দেখতে আপনার মত এতো সুন্দর হয়, তা আগে জানতুম না, শুনেছিলুম, তারা কালা-আদমি, অসভ্য!

—লোকের মুখে শোনা আর নিজের চোখে দেখা এক কথা নয়।

—খুব সত্যি কথা। কিন্তু আমি তো ভারতবাসী দেখেছি! যে সব ভারতীয় ছাত্র য়ুরোপে পড়তে আসে, তারা ধনীর ছেলে,

ভারতবাসী সাহেবদের সঙ্গে মেলামেশা করে কিছু সভ্য হয়। নাহলে শুনেছি শতকরা পঁচানব্বুই জন ভারতবাসী অশিক্ষিত, ভাল করে কাপড়টা পর্য্যন্ত পরতে জানে না। জার্মানীর এক সার্কাস সত্যিকারের ক'জন ভারতীয়কে এনে য়ুরোপে দেখিয়েছিল ; কালো সারা দেহ নগ্ন অসভ্যের মত ছোট্ট এক-টুকরো কাপড় পরে আছে। জানোয়ারের মত মাটীর উপরেই ভাত খায়!*

তোমাদের গান্ধীজীও তো শুনি ছ'হাত কাপড় পরেন ?

আয়েষা সোমালী আরবের ঘরে মানুষ, ভারত সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই সে জানতো না, তথাপি ভারতের প্রতি তার মনের টান ছিল জন্মগত। বললে—গান্ধীজী ও ভারতবাসীর সম্বন্ধে কোন বিদেশীর মুখ থেকে কোন কথা আমি শুনতে চাই না! আমার দেশকে আমার চেয়ে ভাল করে তো কোন বাইরের লোক জানে না! ও-সব কথা রেখে, আপনি আমায় কেন ডেকে পাঠিয়েছেন, তাই বলুন ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভাল, আসল কথাই বলি, তুমি বস—বলে

* বিদেশে ভারতীয়দের হীন ও অসভ্য প্রতিপন্ন করার জন্য জার্মানীর হেগেনবেক সার্কাস আন্যান্য জানোয়ারের মত কয়েকজন গরীব ভারতীয় সাঁওতালকে খাঁচায় পুরে রেখে দর্শকদের দেখাতো। তাদের গায়ে দেবার জামা দিত না, খাবার জন্য থালা দিত না। নিরুপায় হয়ে বেচারাদের সব সইতে হোত। শেষে তা নিয়ে এদেশে আন্দোলন সুরু হলে তবে সেই প্রদর্শনী বন্ধ হয়।

সেনানায়ক পাশের একখানি ক্যাম্প-চেয়ার আয়েষার দিকে এগিয়ে দিয়ে নিজে বসে পড়লো, বললে—তুমি আমায় চিনতে পারছ? আজ সকালে তোমাদের যে কোর্টমার্শাল্ হোল, আমি তার একজন জজ ছিলাম। আমার নাম জান?—

—লেফটেন্যান্ট লিওনার্ডো। একটু বস, তোমার সঙ্গে দুটো কথা আছে—

আয়েষা বসলো না।

লিওনার্ডো মৃদু হেসে বললে—তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে, তুমি একজন সৈনিক হলে লেফটেন্যাণ্টের আদেশ অমান্য করার কি সাজা হোত জান,—মৃত্যু। তোমার সৌভাগ্য তুমি আমাদের সৈন্য নও! বসো—

—না।

—আমার সামনে বসতে তোমার ঘৃণা হচ্ছে? তা হবারই কথা, যে নিষ্ঠুর ভাবে এখানে আমরা মানুষ খুন করে চলেছি, তাতে কেউ আমাদের শ্রদ্ধা করতে পারে না। কিন্তু আমরা তো নিজের ইচ্ছায় একাজ করিনি, আমাদের হুকুম মেনে চলতে হয়েছে। এই যে এত লোকের উপর বিষগ্যাস্ আর বোমা ফেললুম, মেশিনগান্ চালালুম, তাদের কথা কি সহজে ভোলা যায়। এদের কারুর সঙ্গে আমার ঝগড়া ছিল না, কাউকে আমরা চিনতুম না জানতুম না, এরা কোনদিন আমাদের কোন ক্ষতি করেনি, অথচ এদের আমরা খুন করলুম; তাদের আর্ত্তনাদ

আজও আমার কানে বাজছে,...বলে তরুণ লেফটেন্যান্ট তাঁবুর জানালা দিয়ে সুদূর অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের পানে তাকালো। তার মনের কাণায় কাণায় তখনও সৈনিকের নির্ম্মমতা পূরোদস্তুর উপছে ওঠেনি, মনুষ্যত্বের দুর্ব্বলতা মাঝে মাঝে সে মনকে চঞ্চল করে তোলে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে লিওনার্ডো বললে—আজ কোর্ট মার্শালে তোমাদের সকলের প্রাণদণ্ড হয়েছে—

আয়েষা বললে—জানি।

—কাল সকালেই তোমাদের তিনজনকে গুলি করে মারা হবে—

—জানি।

—কমাণ্ডারের কাছ থেকে আমি তোমার প্রাণভিক্ষা চেয়ে নিয়েছি।

—কেন?

—তোমায় দেখেই আমার বড় ভাল লাগলো। মনে হোল যেন এই অসভ্য কালো হাবসী দৈত্যগুলোকে মেরে এহ তেপান্তরের মাঠে আমি এক রাজকন্যার দেখা পেলুম। তাই তোমাকে আমি মরতে দিইনি। তোমায় আমি রাণীর সিংহাসনে বসাবো।

আয়েষার মুখে বিরক্তি ফুটে উঠলো, ক্ষণিকের জন্য তার ভ্রূদুটি কুঞ্চিত হয়ে উঠলো, কিন্তু তখনি সে ভাব গোপন, করে

খিল্‌খিল্‌ করে সে হেসে উঠলো, বললে—রাণী যে হব, রাজ্য কই ?

—রাজ্যের ভাবনা ? আবিসিনিয়া আমরা জয় করেছি। সম্রাট হেইলে-সেলাসী যুদ্ধে হেরে ইংরাজদের জাহাজ 'এন্টার প্রাইজে' চড়ে পালিয়ে গেছে, এখানে আমাদেরই এখন জয়-জয়কার। জেনারেল দেলবানো হবেন এদেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা, একটী প্রদেশের শাসনভার থাকবে আমারই উপর—রাজকন্যার রাজত্বের অভাব হবে না।

আয়েষা খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠলো, বললে—বেশ হবে তাহলে, বেশ হবে ! আমি তখন যা বলব, তাই সবাই শুনবে তো ?

—নিশ্চয়ই !

সহসা বিষণ্ণ স্বরে আয়েষা বললে—আমি তো রাণী হব, আর আমার দুটী ভাই কাল সকালে তোমাদের হাতে খুন হবে ?

—বন্দী ছেলে দুটী তোমার ভাই ?

—হ্যাঁ,...বলে আয়েষা লেফটেন্যাণ্টের একটী হাত ধরে বললে, আচ্ছা, তুমি কি তাদের বাঁচাতে পার না ?

—কমাণ্ডারকে একবার বলে দেখতে পারি, তবে তিনি কি আর আমার কথা রাখবেন ? একবার তোমার জন্য বলেছি, আবার এখন তাদের জন্য বলা...দেখি, কাল ভোরে একবার দেখা করবো—

—এখন দেখা হয় না ?

—একটু আগেই এরোপ্লেন নিয়ে তিনি বেরিয়েছেন, ফিরতে দেরী হবে।

—যদি কাল তিনি তাদের না ক্ষমা করেন,···বলে আয়েষা চিন্তিতমুখে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে আচ্ছা, এখন একবার তাদের সঙ্গে আমি দেখা করতে পারি না, যদি আর দেখা না হয়!

—নিশ্চয়ই। এখনি আমি তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, বলে লেফটেন্যাণ্ট ডাকলেন—আরদালি—

আরদালি ভিতরে এসে সেলাম দিলে।

লেফটেন্যাণ্ট বললে—কাল সকালে যাদের কোর্টমার্শাল হবে তাদের তাঁবুতে এঁকে নিয়ে যাও—

বাধা দিয়ে আয়েষা বললে—আরদালি নয়, তুমি চল—

—অলরাইট্, বলে আয়েষার হাত ধরে লেফটেন্যাণ্ট তাঁবুর বাহির হয়ে পড়লো।

সরোজ ও ডেভিডের চোখে ঘুম নেই। নিশ্চিত মৃত্যুর আগের রাত্রে ঘুমানো শক্ত। মৃত্যুর চিন্তা তাদের মনকে বিভ্রান্ত করে পঙ্গু করে ফেলছে। তারা ভাল করে কিছুই চিন্তা করতে পারছে না।

পাশাপাশি দুটী তাঁবুতে দুজনে আছে, কথা বলার এতটুকু সুবিধা পর্য্যন্ত

লেফটেন্যান্ট বন্দী-শিবিরের সামনে আসতেই সান্ত্রী স্যালুট করলে, লেফটেন্যাণ্ট বললে, এই দুটী তাঁবুতে তোমার দুই ভাই বন্দী আছে!

—বেশ, তুমি একটু বাইরে দাঁড়াও, আমি দেখা করে আসছি বলে আয়েষা তাঁবুর পর্দ্দা ঠেলে ভিতরে ঢুকলো।

অন্ধকার তাঁবুর এককোণে সরোজ বসেছিল, আয়েষা ভিতরে ঢুকতেই চমকে উঠলো, জিজ্ঞেস করলে—কে?

—আমি।

—আমি কে?

—আমি আয়েষা।

—আয়েষা! কে আয়েষা? কোন্ আয়েষা? আয়েষা এখানে এল কেমন করে?

সরোজের মনের অবস্থা তখন বিভ্রান্ত, ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের মত।

আয়েষা সরোজের কাছে গিয়ে তার কাঁধের উপর একখানি হাত রাখলে, সরোজ বিহ্বল চোখে চারিপাশে একবার তাকিয়ে দেখলে, বললে—এঁ্যা! এরই মধ্যে সকাল হয়ে গেল? এখুনি আমাদের মরতে হবে?

—না না, তোমাদের মরতে হবে না, আমি তোমাদের মুক্ত করে দিতে এসেছি।

—তুমি আমাদের মুক্ত করে দেবে? তুমি কে?

—আমি আয়েষা।

—আয়েষা! ইস্‌মাইল সেখের মেয়ে আয়েষা?

—হ্যাঁ।

সরোজ এবার তীক্ষ্ণচোখে আয়েষার মুখের পানে তাকালো, অন্ধকারে সে-মুখখানি ভাল করে চেনবার চেষ্টা করলে। কতক্ষণ দেখে দেখে তারপর বললে—ওঃ তুমি আয়েষা, বুঝেছি!

—বুঝেছ তো বেশ। এখন পালাতে চাও? বাঁচতে চাও?

এতক্ষণে যেন সরোজ সচেতন হোল, উঠে দাঁড়াল, বললে—নিশ্চয়ই! কি করতে হবে বল?

—পাশের তাঁবুতে মিস্টার ডেভিড আছে, তাকে নিয়ে আমার পিছু পিছু এসো—

—এই অবস্থায়? বলে সরোজ হাতকড়ি লাগানো দুটা হাত আয়েষার সামনে তুলে ধরলে।

—ওঃ হাতে হাতকড়ি লাগানো আছে, আচ্ছা, আমি এখুনি খুলে দিচ্ছি, বলে আয়েষা বাহিরে এসে দাঁড়ালো। লেফটেন্যান্ট সামনে পায়চারী করছিল জিজ্ঞেস করলে—দেখা হোল?

—হ্যাঁ। কিন্তু আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে লেফটেন্যান্ট!

—কী?

—আমার ভাইয়ের বড় কষ্ট হচ্ছে, হাতকড়ির চাবিটা একবার দাওনা ওদের হাতকড়িটা খুলে দিয়ে আসি।

—তারপর যদি পালিয়ে যায়?

—আমি তো রইলুম। তাছাড়া তোমাদের এতো সিপাই-সান্ত্রী...

লেফটেন্যাণ্ট হেসে সান্ত্রীকে আদেশ করল—হাতকড়ির চাবিটা একে দাও—

রক্ষীর হাত থেকে চাবি নিয়ে আয়েষা আবার তাঁবুর মধ্যে ঢুকলো। সরোজের হাতের হাতকড়িটা খুলে দিয়ে বললে—এই নাও চাবি। তাঁবুর পিছন দিকে কোন পাহারা নেই। পিছন দিকের পর্দ্দা তুলে চুপি চুপি বেরিয়ে, পাশে মিস্টার ডেভিডের তাঁবুতে যাবে, তার হাতকড়ি আমি খুলে দিতে যাচ্ছি। দুজনে নিঃশব্দে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আমার অনুসরণ করবে—নাও বেরিয়ে পড়—বলে আয়েষা চাবিটা হাতে নিয়ে সরোজের তাঁবু থেকে বাহির হয়ে পাশে ডেভিডের তাঁবুতে ঢুকলো।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই আয়েষা ডেভিডের তাঁবু থেকে বাহির হয়ে এল। চাবিটা রক্ষীকে ফেরৎ দিয়ে লেফটেন্যাণ্টের সঙ্গে অগ্রসর হোল। সামনের মাঠে কয়েকটা বোমারু প্লেন দেখা যাচ্ছে। দুদিক থেকে দুটো বড় বড় ফ্ল্যাশ্ লাইট্ সেই মাঠকে আলোয় আলো করে রেখেছে। অ্যালুমিনিয়ামের প্লেন-গুলির রূপালী দেহ আলো পড়ে ঝিলমিল করছে। সহসা দেখলে মনে হয় যেন এক ঝাঁক শাদা পায়রা চাঁদের আলোয় মাঠের বুকে ঘুমিয়ে পড়েছে।

দুজনে চুপ করে এগুচ্ছিল, আয়েষা কথা সুরু করলে—আচ্ছা, লেফটেন্যাণ্ট, হঠাৎ যদি হাবসীরা আজ রাত্তিরে তোমাদের আক্রমণ করে, কি করবে?

—তারা তো সব হেরে পালিয়ে গেছে, আবার আক্রমণ করবে কি?

—যদি আক্রমণ করে, কি করবে?

—লড়বো। যতক্ষণ রাইফেল হাতে আছে ততক্ষণ কাকে ভয় করি?

আয়েষার চোখ দুটী উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললে—লেফটেন্যাণ্ট তুমি ভাল গুলি চালাতে পার?

—নিশ্চয়ই।

—আচ্ছা, এখান থেকে এক গুলিতে ওই ফ্ল্যাশ্ লাইটের কাঁচটা ভেঙে দিতে পার?

ওঃ, এই কথা! আমাদের দেশে একটা দশবছরের ইস্কুলের ছেলেও ওই লক্ষ্য ভেদ করতে পারে!

—আচ্ছা কর না, দেখি?

—বেশ…বলে হাসতে হাসতে লেফটেন্যাণ্ট রাইফেল্ বাগিয়ে ধরে, একটী ফ্লাশ্ লাইট লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে। লাইটটা বেশী দূরে ছিল না। লেফ্টেন্যাণ্টের গুলি লেগে তার কাঁচখানা ঝন ঝন করে ভেঙে গেল, সে দিকটা অন্ধকার হয়ে গেল।

দুজন সৈনিক ছুটে এল, লেফ্‌টেন্যাণ্ট হাহা করে হেসে উঠে বললে—যা যা নতুন লাইট্‌ বসা গে যা—

সৈনিকেরা স্যালুট দিয়ে চলে গেল।

আয়েষা বললে—লেফটেন্যান্ট, ওই লাইটটাকেও ভেঙে ফেল দিকি, সমস্ত মাঠটা অন্ধকার হয়ে যাবে—ভারী মজা হবে—

—কিন্তু…

—কিন্তু কেন? নতুন লাইট তো ওরা এখুনি আবার বসাবে—

লেফটেন্যাণ্ট আবার রাইফেল তুলে নিলেন। এই ফ্ল্যাশ লাইটটী ছিল দূরে। ট্রিকার টেপার সঙ্গে সঙ্গে ঝন ঝন করে সেটীও ভাঙলো—চারিদিক অন্ধকার। সৈনিকদের মধ্যে সোরগোল উঠলো। আয়েষা খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠলো, লেফটেন্যাণ্টও সে হাসিতে যোগ দিলেন।

হাসি থামিয়ে আয়েষা পিছনে তাকালো, চাঁদের আলোয় গাছের আড়ালে দুটী ছায়ামূর্ত্তি দেখা গেল। সেদিকে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আয়েষা লেফটেন্যাণ্টের হাত ধরে আব্দারের সুরে বললে—লেফ্‌টেন্যাণ্ট, এবার আমি একটা গুলি ছুড়বো—

—দাঁড়াও তাহলে একটা গুলি এতে ভরে দি,—বলে লেফ্‌টেন্যান্ট একটী গুলি ভরে রাইফেল্‌টী আয়েষার হাতে দিলে। আয়েষা একবার কাছাকাছি কেউ আছে কিনা দেখে নিয়ে, চোখের নিমেষে মাটীর উপর শুয়ে পড়ে, লেফটেন্যান্টের

দিকে বন্দুকের নল ফিরিয়ে ট্রিকার টিপ্‌লো। এতো কাছে লক্ষ্য ব্যর্থ হয় না। গুলি খেয়ে লেফটেন্যাণ্ট ধড়াস করে পড়ে গেল, মুখ দিয়ে একটা শব্দ পর্য্যন্ত বেরুলো না।

আয়েষার সর্ব্বাঙ্গ থরথর করে কেঁপে উঠলো, সে আর এক সেকেণ্ড সেখানে দাঁড়ালো না। পিছনে যে দুটী ছায়ামূর্ত্তি দেখা যাচ্ছিল সেইদিকে ছুটলো।

ছায়ামূর্ত্তি দুটী সরোজ ও ডেভিড। আয়েষার কথা মত অন্ধকারে তারা পিছুপিছু আস্‌ছিল। আয়েষা তাদের কাছে এসে বললে—আর এক মিনিট দেরী করা চলবে না, ছুটে এসো—

তিনজনে ছুটলো।—

তাঁবুগুলিকে পিছনে ফেলে তারা এসে পড়লো প্লেনগুলির কাছে। ক'জন সেনা ভাঙা লাইট দুটিকে মেরামত করতে ব্যস্ত। চারিপাশের অন্ধকারে চাঁদের আলোটুকুই একমাত্র সম্বল। সেই আলোছায়ার মধ্যে তারা তাড়াতাড়ি অগ্রসর হোল একখানি প্লেনের দিকে।

ওদিকে প্রহরীর বজ্রকণ্ঠ শোনা গেল—কে যায় ওখানে?

আয়েষা উত্তর দিলে—বন্ধু! তারপর সরোজ ও ডেভিডকে লক্ষ্য করে বললে—শীগ্‌গীর একখানা প্লেনে উঠে পড়, নাহলে এখুনি প্রাণ হারাতে হবে—

রক্ষী জিজ্ঞেস করলে, কী চাই?

প্লেন।

—হুকুম-নামা ?

—সঙ্গে আছে।

—দিয়ে যাও !

—নিয়ে যাও—

ব্যাপার ভাল মনে না হওয়ায়, সন্দেহে রক্ষী সরোজদের দিকে অগ্রসর হোল

আয়েষা ততক্ষণে ডেভিডের হাত ধরে একখানি প্লেনের মধ্যে উঠে বসেছে। রক্ষী কাছে এসে পড়ার আগেই সরোজ সজোরে প্রপেলারটা ঘুরিয়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠে বসলো। ঘস্‌ঘস্ করে গর্জ্জন তুলে বোঁ করে সামনের মাঠে খানিকটা ছুটে গিয়েই প্লেনখানি লাফিয়ে উঠলো শূন্যে।

প্রহরী চিৎকার করে উঠলো।

নীচে সোরগোল পড়ে গেল।

তির্য্যক্ গতিতে সন্ধানী-আলো এসে পড়লো প্লেনখানির উপরে। শট্‌শট্ করে কয়েকটা গুলি ছুটে গেল এদিকে ওদিকে, দু-একটা এসে প্লেনের পাখায় ফুটো করে দিলে।

ডেভিড সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে প্লেনের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে সুরু করলে, স্পিডোমিটারের লাল কাঁটাটা থরথর করে কেঁপে উঠলো—পঞ্চাশ—ষাট—সত্তর—আশী—নব্বুই—একশো—একশো দশ—একশো বিশ—একশো পঁচিশ—

সার্চলাইটের আলো পিছনে কোথায় ফুরিয়ে গেল, ইতালিয়ান সেনার ছাউনি নীচে কতদূরে পড়ে রইল, চাঁদের আলোয় রূপালী পাখা মেলে সরোজদের প্লেন ছুটলো।

পিছনে দুটো ফড়িংয়ের মত দুখানি ইতালিয়ান প্লেন দেখা গেল, আত্মগোপন করার জন্য ডেভিড পেঁজা তুলোর মত একখানি শাদা মেঘের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। ডেভিড প্লেনের গতি আরো বাড়িয়ে দিলে।

মেঘ পার হয়ে যখন আবার তারা মুক্ত আকাশে এসে পড়লো, চাঁদ তখন মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে। পিছনের অনুসরণ কারী প্লেন দু'খানি আর দেখা যায় না, সামনের অন্ধকারে দৃষ্টি চলে না। নীচে অন্ধকার মাটীর বুকে জমাট বেঁধেছে, উপরের অন্ধকারে একরাশ তারা মিটমিট করে হাসছে। যেন এক বিরাট অন্ধকার দৈত্য রাহুর মত পৃথিবীকে গ্রাস করার জন্য ওঁৎ পেতে বসে আছে। চারিপাশে শুধু ভয়াবহ অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে অন্ধের মত সরোজদের প্লেন ছুটে চলেছে একশো পঁচিশ মাইল বেগে নিরুদ্দেশের সন্ধানে—ইতালিয়ান সীমান্ত পার হয়ে যাবার জন্য। তিনজন যাত্রীর কানে এসে লাগছে প্রপেলারের বনবন শব্দ, গায়ে লাগছে বাতাসের ঝড়ো ঝাপটা, দুর দুর করে [illegible] আনন্দে।